যে রাতে জোছনার রঙ লাল হয়েছিল
আদনান শাহরিয়ার
গ্রন্থ প্রকাশ

আদনান শাহরিয়ার

যে রাতে জোছনার রঙ লাল হয়েছিল

প্রকাশকাল: আগস্ট, ২০১৫

প্রকাশক: গ্রন্থ প্রকাশ, grontho.com

grontho.com@gmail.com

প্রচ্ছদ: রাগীব নিয়াজ রাফি

প্রচ্ছদের মূল শিল্পকর্ম:

এই বইটি ক্রিয়েটিভ কমন্স লাইসেন্সের আওতাধীন। এর অর্থ হল, এই বইটি যেকোন অবাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে বিতরণ ও পুনরুৎপাদনযোগ্য। ক্রিয়েটিভ কমন্স লাইসেন্স সম্পর্কে জানতে দেখুন, http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/

সূচী

আকাশ দস্যুতা এবং মাতাল রাতেরসেই মেয়েটির গল্প (১)
আমাদের শহরের সেই সব নাগরিক গল্পখোরেরা (১১)
এক ঈদ সংখ্যায় জনৈক রিক্সাওয়ালার সাক্ষাৎকার (১৪)
একজন ডাকপিয়ন ও আমি (১৮)
একজন ব্যর্থ মানুষের অপেক্ষা (২৪)
একটি বন্দী দীর্ঘশ্বাসের আত্মকথন (২৮)
কুড়ি বছর পরের একদিন (৩১)
ক্ষুধা অথবা পরাজয়ের গল্প (৩৬)
থেকো অপেক্ষমান অজস্র অশ্রু জলাধারের ওপাশে (৩৮)
দাঁড়কাক সময়ে এক সবুজ প্রজাপতির গল্প (৪৫)
নিকষ অন্ধকার (৪৮)
বাকের ভাইদের জন্য এলিজি (৫১)
যে কারনে আজ মধ্যরাতে আমার মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হবে (৫৩)
যে রাতে আমরা একটা কবিতার দোকান পুড়িয়েছিলাম (৫৬)
মৃত নীড় (৫৯)
যে রাতে জোছনার রঙ লাল হয়েছিল (৬১)
হার-জিত (৬৫)

আমার জন্ম রাজশাহীতে । নানিবাড়িতে। বাবা সরকারি চাকরিজিবী, মা গৃহিনী। আমার শৈশবের শুরু জয়পুরহাটে। বাবার সরকারি চাকরীর সুবাদে অনেক জায়গায় ঘোরা হলেও তৃতীয় শ্রেনী থেকে রাজশাহীতে স্থায়ী নিবাস। স্কুল জীবনের শুরু বগুড়াতে হলেও তৃতীয় শ্রেনীতে এসে ভর্তি হই রাজশাহী গভ: ল্যাবরেটরী হাই স্কুলে। প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা আমাকে কখনই আকর্ষণ করেনি। তাই নামের পাশে ডিগ্রি থাকলেও আমি আমি আসলে প্রাতিষ্ঠানিকভাবে অশিক্ষিত। বর্তমানে কর্মরত আছি একটি বেসরকারি আইটি প্রতিষ্ঠানে। আর লিখছি। লিখতে চাই অনেক কিছু। আর ঘুরে ঘুরে দেখতে চাই জীবনের কোণায় কোণায়।

"শেষপর্যন্ত জীবন মানেই তো অসমাপ্ত গল্পের সমাপ্তির অপেক্ষা। মানুষ অপেক্ষা করতে পছন্দ করে না তবু তার জীবন কাটে অপেক্ষায়, অপেক্ষায়..."

আকাশ দস্যুতা এবং মাতাল রাতের সেই মেয়েটির গল্প

১

আকাশ দস্যুতা

নীলিমা স্কাই বিল্ডারস এর প্রধান আজিজ সাহেব মুখ বেজার করে বসে আছেন । মুখ বেজার করে থাকার যথেষ্ট কারণ আছে বৈকি । তিনি এক মাস আগে একটি নির্দেশ দিয়েছেন অথচ এখনও সেটা পালন হয়নি । তিনি জিএম আদনানকে ডাক দিলেন । এই আদনান আর তিনি মিলেই গড়ে তুলেছেন নীলিমা স্কাই বিল্ডারস । মূল আইডিয়া অবশ্য আদনানেরই ছিল , কিন্তু টাকা ছিলো না । সে তার আইডিয়া নিয়ে নানা জায়গায় গেছে , সবাই হেসে উড়িয়ে দিয়েছে । অবশ্য না দেওয়ারও কিছু ছিলো না । কেউ যদি বলে, মানুষের বসবাসের জন্য গ্যাসবেলুনের ব্যাবস্থা করলে কেমন হয় তাহলে যে কেউই তাই করবে ! তার আইডিয়া ছিলো, মানুষ যে হারে বেড়ে যাচ্ছে তাতে কিছুদিন পর মানুষের থাকার জন্য আর জায়গা থাকবে না । সব জমি চলে যাবে ভুমিদস্যুদের দখলে , কিন্তু তাদের বানানো ফ্লাটও একসময় সোনার হরিন হয়ে যাবে মানুষের কাছে । তখন হন্যে হয়ে মানুষ জায়গা খুঁজবে বসবাসের , কিন্তু পাবেনা , সেই সময়ের জন্য যদি আমরা আকাশটা দখল করে নেই তাহলে কেমন হয়?? একেকটা বিল্ডিঙের ছাদে যতগুলো সম্ভব গ্যাসবেলুন । সেই গ্যাসবেলুনে থাকবে অন্তত তিন জন মানুষ থাকার ব্যাবস্থা । সারাদিন আকাশে এক জায়গায় স্থির থাকবে বেলুন । ঝড় বৃষ্টি বা শীতে ফলস সিলিং দিয়ে ঢেকে দেওয়া যাবে । বিল্ডিঙের ছাদে মোটা দড়ি দিয়ে বেঁধে রাখা হবে বেলুনবাড়িগুলো । ছাদ থেকে ওঠা নামার জন্য ব্যাবহার করা হবে দড়ির মই । আর প্রতিমাসে হওয়া ভাড়া দিতে হবে । আর বেলুনগুলোর ঠিকানা হবে , বিল্ডিঙের নাম্বার অনুসারে , যেমন , ১২/৩ বিল্ডিং ৪ নাম্বার বেলুন ! আজিজ সাহেব বুঝতে পারেন ভবিষ্যতে এটাই হতে যাচ্ছে । তাই তিনি আর দেরি না করে এই খাতেই বিনিয়োগ শুরু করলেন । প্রথমে অনেকেই পাগলামি ভেবেছিলো । কিন্তু কয়েক বছর পর দেখা গেলো সত্যিই ফ্ল্যাট সব সোনার হরিন হয়ে গেছে মধ্যবিত্তদের কাছে । তখন তারা বেলুনবাড়ির পেছনেই ছুটছে । সময় লাগলেও আজিজ সাহেবের ব্যাংক ব্যাল্যান্স ফুলে ফেপে উঠলো । কিন্তু বেড়ে গেলো প্রতিদ্বন্দ্বী । এখানেও জমি দখলের মতো করে সবাই আকাশ দখলের লড়ায়ে নেমে গেলো । কিছুদিনের মধ্যেই আকাশে আর নীল দেখা যায় না । তাকালেই শুধু নানা ডিজাইনের বেলুন

। নীল নয় রঙ্গিন আকাশ দেখে অভ্যস্ত হতে শুরু করলো মানুষ । সুযোগ বুঝে ছাদওলারা বেশি ভাড়া দাবি শুরু করলো, সরকার ধার্য আকাশসীমার ট্যাক্স । আর উপদ্রপের মতো পিছনে লেগে থাকলো সমাজের কবি সাহিত্যিক নামের কীটগুলো । আকাশ দেখতে না পেয়ে তাদের সৃষ্টিশীলতা নাকি থেমে যাচ্ছে, বাচ্চাদের নাকি মানসিক গঠন সুস্থ হচ্ছে না । আজ তারা মানববন্ধন করে কাল কবিতা লিখে । তারা আজিজ সাহেবের নাম দিয়েছে আকাশদস্যুদের সর্দার । তাতে আজিজ সাহেবের থোড়াই কেয়ার । পারলে তোরা মানুষের বাসস্থান করে দে , তা তো পারবি না । আজও তারা কি এক কর্মসূচী ডেকেছে । কিন্তু তিনি সেসব নিয়ে চিন্তিত না, তিনি চিন্তিত একটা বাড়ির ছাদ কিছুতেই দখল করতে পারছেন না বলে । সেখানে একটা ছাদে একবেলুনে একজনই থাকে, কিন্তু সেই পুরোটা ছাদ দখল নিয়ে থাকে । তাকে উৎখাত করতে পারলেই তিনি নতুন প্রকল্প শুরু করতে পারেন কিন্তু গত একমাস ধরে সে নির্দেশ দিয়েও সে কাজ হয়নি । তিনি আবারও আদনান সাহেবকে ডাক দিলেন।

পূর্বকথা: আমি এবং সেই মাতাল রাতের মেয়েটি

যারা একাকী বড় হয় তাদের নানারকম মানসিক সমস্যা নিয়ে বড় হয় । বেশিরভাগই সাধারণ সমস্যা । আমার ছোটবেলায়, প্রায় বন্দী অবস্থায় বড় হওয়ার কারনে নানারকম মানসিক সমস্যা আমারও আছে । এর মাঝে সাধারণ একটা সমস্যা হচ্ছে, আমি মাঝে মাঝে একসাথে দুইটি দৃশ্য দেখি । একটা বাস্তব, একটা হেলুসিনেশন । কঠিন লাগছে?? বুঝিয়ে বলি, ধরা যাক, আমার সামনে দুইজন লোক বসে আছে । একজন লোক হঠাৎ আরেকজন লোকের পিঠে আদর করে চাপড় দিলো । আমি সেই দৃশ্য দেখবো , সাথে সাথে আমার মস্তিস্ক আরেকটি দৃশ্য তৈরি করবে যেখানে আমি দেখবো, লোকটা আসলে তার পিঠে ছুরি বসাচ্ছে । ঠিক জানি না, হয়তো দুটি দৃশ্যর মাঝে সেকেন্ডের ভগ্নাংশ পার্থক্য থাকে বলে আমি বুঝতে পারি কোনটা আসল আর কোনটা হেলুসিনেশন । মাঝে মাঝে আমার ভয় হয়, যদি কখনও এই সেকেন্ডের পার্থক্য ঘুচে যায় ? আমি যদি আর দুইটা দৃশ্য আলাদা করতে না পারি ??

এই মুহূর্তেও আমার মধ্যে সেই ভয়টা কাজ করছে । এই মুহূর্তে আমার সামনে যে মেয়েটাকে বসে

থাকতে দেখছি তাকে আমার বিভ্রম মনে হওয়ার কারণ নেই , অথচ হচ্ছে । যেদিন তাকে প্রথম দেখি তাকে কিন্তু বিভ্রম মনে হয়নি । অদ্ভুত হলো তখনই বিভ্রম হওয়ার সুযোগ ছিলো বেশি । ঝমঝমে বৃষ্টির রাত, যাত্রী ছাউনিতে মেয়েটা একা বসে ছিল । আশেপাশে শেষ জনমনুষ্য বলতে আমি । সেও পুরোপুরি সুস্থ না । সদ্যবিবাহিত সহকর্মীর লক্ষ্মী সুন্দরী বউটি দেখে ঈর্ষান্বিত আমার বহুবছরের অবদমিত নিঃসঙ্গতা জেগে উঠেছিলো তীব্র ব্যাথা নিয়ে । সেই ব্যাথা কমাতেই পেটে কিছু তরল চালিয়েছিলাম । অনভ্যস্ত পাকস্থলী বোধহয় তা সহ্য করতে পারছিলো না । পেট বাঁকিয়ে ভাঙ্গাচোরা ভঙ্গিতে বসে বসে আড়চোখে তাকাচ্ছিলাম মেয়েটির দিকে । মেয়েটি কিন্তু সরাসরিই তাকিয়ে ছিলো আমার দিকে । কোনও দ্বিধা কোনও জড়তা নেই । ঠিক এখন যেভাবে তাকিয়ে আছে ।

“ কিছু বলবেন না বুঝি ??” মেয়েটার কোথায় সৎবিত ফিরে আমার । আমি মৃদু হাসলাম । মেয়েটি বলল, সেই রাতের কথা ভাবছেন তো ?? আমি আবার বিভ্রান্ত হই । এই মেয়েটি কি আমার মনের কল্পনা নয় ?? নাহলে আমার মনের কথা টের পাচ্ছে কিভাবে ?? আমি অস্বস্তিবোধ করি । মেয়েটা আবার বলে ওঠে, অস্বস্তিবোধ করার কিছু নেই । আপনি সহজ হন । আমি সহজ হওয়ার চেষ্টা করি । যেমন সে রাতে করেছিলাম । তার দিকে হাসি দিয়ে । তবে হাসিতে মনে হয় আমার অসুস্থতাই ফুটেছিল বেশি । মেয়েটা আমাকে অবাক করে দিয়ে বলেছিলো, আপনার কি বমি পাচ্ছে ?? আমি তাকালাম তার দিকে সরাসরি । আমার ঝাপসা চোখে তাকে মনে হচ্ছিলো সে আমার বন্ধুর বউটি কিংবা আরও পরিচিত কেউ । দীর্ঘদিন আগে হারিয়ে ফেলেছিলাম আজ আবার দেখা হয়েছে হঠাৎ । আমার বুকে আবার বেজে উঠেছিলো কনকনে নিঃসঙ্গতার কষ্ট । এই ভাবনাটি কিও ধরতে পারলো মেয়েটি ?? জিজ্ঞেস করলো, আপনার মা বাবা থাকেন না আপনার সাথে ?? আমি বললাম, না । অনেক ছোটবেলায় মারা গেছেন তারা ।

- ওহ অ্যাই আম সরি ।
- নো ইটস ওকে
- তারপর আপনি কার কাছে বড় হলেন ??
- এতিম খানায় ।
- ওহ

মেয়েটার চোখে বিষাদ ফুটে উঠলো । আসলেই কি ফুটে উঠলো নাকি সেটা আমার কল্পনা । মেয়েটা আবার জিজ্ঞেস করলো , আপনার শরীর এখন কেমন ?? আমি কিছু না বলে হাসলাম । সুস্থ হাসি । মেয়েটা আবার বলল, "প্রথম পরিচয়েই কোনও মেয়ের সামনে বমি করে দেওয়া কোনও কাজের কথা না"। আমি লজ্জা পেলাম । কিন্তু থামলো না। একটু দুষ্টু হাসি দিয়ে বলল, "তাও আবার মাতাল হয়ে !" আমি জানি, আসলেই কাজের কথা না । তাই শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত বমিটা আটকে রাখার চেষ্টা করেছিলাম আমি । কিন্তু শেষ রক্ষা হয়নি । শরীর গুলিয়ে আসছিলো , মনে হচ্ছিলো পেটের ভিতরে যা কিছু আছে, কিডনি লিভার সব যেনও টেনে হিঁচড়ে বেরিয়ে আসতে চায় । মৃত্যু কি খুব কাছে চলে এলো আমার ?? একসময় অনুভব হলো মেয়েটি আমার কাছে এসে দাঁড়িয়েছে । কোমল স্পর্শ পেলাম আমার কাঁধ আর মাথায় । নরম সুরে মেয়েটা বলেছিল, মাথাটা আরেকটু নীচে করুন । আমার মনে হয়েছিলো, এই যাত্রায় হয়তো মারা যাবো না ।

- দেখুন আপনাকে অস্বস্তি ফেলার জন্য আমি কথাগুলো বলছি না । মজা করার জন্য বলছি । আবার বাস্তবে ফিরে আসি আমি । বললাম, বুঝতে পেরেছি । হাসলাম । মেয়েটার মুখে আবার দুষ্ট হাসি ফিরে আসলো , বলল, "সেদিন আপনি আমাকে একটা প্রস্তাব দিয়েছিলেন মনে আছে ??" আমি জানতাম, এই প্রসঙ্গ আসবেই । বমি হওয়ার সময় যখন মেয়েটা আমার পাশে দাঁড়িয়ে ছিলো আমার মনে হচ্ছিলো অনন্তকাল পর কেউ আমাকে এতো কোমলভাবে স্পর্শ করছে । আমার আজন্ম তৃষ্ণার্ত হৃদয় গুমরে উঠেছিলো । মনে হচ্ছিলো, এই হাত এই স্পর্শ যেনও অনন্তকাল থাকে । তখন মেয়েটিকে আর অচেনা কেউ মনে হচ্ছিলো না । বোধহয় এমন একটা মুহূর্তের জন্যই মানুষ অপেক্ষা করে সারাটি জীবন । কেউ পায় কেউ পায় না । আমি সেই ঘোরের ভিতরেই বলে বসলাম, আমি আপনাকে বিয়ে করতে চাই । জানি এটা খুব একটা আদর্শ মুহূর্ত নয় এমন প্রস্তাব দেওয়ার কিন্তু এর চেয়ে খাদহীন অনুভূতিও আর কখনও আসবে না । মেয়েটি শুনে হতভম্ব হয়ে গিয়েছিলো । আজ সেসব মনে পড়ায় অজান্তেই হাসলাম আমি । আমাকে হাসতে দেখেই মেয়েটি আবার জিজ্ঞেস করলো, আপনার বুঝি কোনও গার্লফ্রেন্ডও নেই ?? আমি বললাম, না । মেয়েটা সব জান্তার একটা ভাব নিয়ে বলল, আমিও তাই ধারণা করেছিলাম । গার্লফ্রেন্ড থাকলে বুঝতেন কখন একটা মেয়েকে প্রস্তাব দিতে হয় , কখন হয়না। আমি কিছুক্ষণ চুপ থাকলাম । তারপর বললাম, "ঠিক তা নয় । আমি আসলে ছোটবেলা থেকে একা একা বড় হয়েছি । একা একা মানে শুধু বাবা মাকে ছাড়া তা নয় ,

আমি যে এতিমখানায় থাকতাম সেখানের পরিবেশের সাথেও আমি মানিয়ে নিতে পারিনি । সবসময় চুপচাপ থাকতাম । কারও সাথে মেশার চেয়ে নিজের সাথে কথা বলতেই বেশি ভালো লাগতো আমার । তীব্র নিঃসঙ্গতাতে আমার অভ্যস্ত হয়ে যাওয়ার কথা, হয়েছিলামও । বড় হয়ে স্কুল, কলেজ বা ভার্সিটিতেও আমার তেমন বন্ধু ছিলো না আমার চুপচাপ স্বভাবের কারনে । অফিসেও নেই । কিন্তু শেষপর্যন্ত মানুষই তো । অভ্যস্ততার বাহিরেও অন্তরের অন্তঃস্থলে কি যেনও একটা থেকে যায় । ক্লান্তির শেষে একটু বেঁচে থাকার আকাঙ্ক্ষা কিংবা কোনও তারা ঝরে যাওয়া রাতে কারও হাত ধরে আকাশ দেখা । আপনাকে দেখে হঠাৎ মনে হয়েছিলো, আপনি আমার বহুদিন আগে হারিয়ে যাওয়া কেউ যার জন্য আমি ঘুরে ঘুরে অবশেষে এখানে এসে দাঁড়িয়েছি" । এইবার মেয়েটির চুপ থাকবার পালা । কিছুক্ষণ পর সে বলল, তারমানে সেদিনের কথাটা শুধুই ক্ষণিকের আবেগ কিংবা মাতালের প্রলাপ ছিলো না । আমি বললাম, না । মেয়েটি আর কিছু বলল না । খানিকপর উঠে দাঁড়িয়ে বলল, আচ্ছা আমি যাই । আমি তখনও একটু আগের বলা কথাগুলো নিয়ে বিভ্রান্ত । সারা জীবনের চুপচাপ আমি হঠাৎ এতো কথা বলে ফেললাম কিভাবে কে জানে ! তারচেয়েও বেশি অস্বস্তিকর, মেয়েটি কি ভাবলো , এরপরে কি ভাববে সে আমার সম্পর্কে ! আমার কি মেয়েটিকে থামানো উচিৎ?? আমি মনে হলো আমি যেনও পিচ্ছিল কেকের উপর দিয়ে হাঁটছি । মেয়েটা উঠে দাঁড়িয়ে চলে যাচ্ছে তবুও আমি চুপচাপ দাঁড়িয়ে দেখছি, যেমন আমি সারাটি জীবন চুপচাপ দেখেছি অসংখ্য হারিয়ে যাওয়া । এর আগের দিন, বমি করার পর, মেয়েটা যখন আমাকে বাড়ি পৌঁছে দিচ্ছিল তখন পরম নির্ভরতায় তার পাশে হেঁটেছি যেনও এর কোনও শেষ নেই । আজ তাকে হেঁটে চলে যেতে দেখে অদ্ভুত শুন্যতা গ্রাস করলো আমাকে যেন এরও কোনও শেষ নেই । এতক্ষণে আমার মনে হলো, মেয়েটার আমার অসুস্থ মনের কল্পনা নয়, আমার পাঁজর চেরা কষ্টের অংশ ।

কিন্তু সেই ভাবনা কাটতেও বেশি দিন দেরি হলো না আমার । মেয়েটা চলে যাওয়ার পর প্রতিটা দিন আমি অপেক্ষা করেছি সে আসবে । এইবার আসলে আর কোনও ভুল করবো না । ঠিক তার নাম জিজ্ঞাসা করবো । জিজ্ঞাসা করবো ঠিকানা । কিন্তু সে আর এলো না । এলোই না । হঠাৎ এক সকালে তার একটা চিরকুট এলো । একটা ঠিকানা দিয়ে লিখা, আজ এই জায়গাটায় চলে আসবেন বিকেল ৪ টায় । আপনার জন্য চমক আছে । ইতি , সেই মাতাল রাতের মেয়েটি । আমি গেলাম ।

অপেক্ষা করলাম । বিকেল গড়িয়ে সন্ধ্যা , সন্ধ্যা গড়িয়ে রাত । কিন্তু তার দেখা পেলাম না । আবার ফিরে এলো সন্দেহ । আসলেই কি মেয়েটি ছিলো ?? নাকি কাল্পনিক সব চরিত্র তৈরি করে নিঃসঙ্গতা দূর করার আমার সেই পুরানো অসুখ ?? বাসায় এসে অনেক খুঁজেও চিরকুটটা পেলাম না । আমার সন্দেহ দৃঢ় হলো । হয়তো রাতের বেলা ঘুমের মাঝে নিজেই চিরকুটটি লিখেছিলাম কিংবা চিরকুটটাও আমার একটা কল্পনা ছিলো দীর্ঘদিন তাকে দেখতে না পেয়ে আমার হতাশ অবচেতন মন আমার জন্য এইভাবে গল্প সাজিয়েছিলো । প্রচণ্ড মন খারাপ হলো । অসংখ্য চোরা অশ্রুর সাক্ষী বোবা বালিশটাকেই একমাত্র সত্যি মনে হলো আমার ।

(আবার) আকাশ দস্যুদের অফিসে

আদনান সাহেব তার সামনে এসে দাঁড়াতেই আজিজ সাহেব বললেন, এই বাড়ির ছাদ এখনও দখল হয়নি কেনও ??

- স্যার ওই বেলুনবাড়িতে যিনি থাকেন তিনি ছাড়তে চাচ্ছেন না
- তাকে টাকা অফার করা হয়েছে ??
- জি । যত দাম তার বেশিই করা হয়েছে । কিন্তু তিনি ফিরিয়ে দিয়েছেন ।
- হুমকি দেওয়া হয়েছে ??
- জি তাও দেওয়া হয়েছে । কিন্তু লাভ হয়নি !
- আশ্চর্য ! কেনও ?? তার দাবি কি??
- তার কোনও দাবি নেই ।
- তাহলে কেনও ছাড়ছে না ??
- স্যার ভদ্রলোক একজন মেয়েকে পছন্দ করেন । কিন্তু মেয়েটার নাম ঠিকানা জানেন না । শুধু মেয়েটা তার ঠিকানা জানে । তার ভয় তিনি সেখান থেকে চলে গেলে আর কেউ কাউকে খুঁজে পাবেন না ।
- আজব !
- জি
- এই সময়েও কেউ ২০১৩ এর আবেগ নিয়ে চলে জানতাম না । মনে হচ্ছে, এটাও কবি

সাহিত্যিকদের মতো কীট ।

আদনান সাহেব কিছু বললেন না । আজিজ সাহেব আবার বললেন, তার মতো আবেগ নিয়ে কাজ কারবার আমাদের নয় । আবেগ দিয়ে কিচ্ছু হবে না । আপনি আজকের রাতের মধ্যে উচ্ছেদের ব্যবস্থা করেন ।

- জি স্যার

- কিছু বলার দরকার নেই। শুধু ছাদের হুকের দড়িটা কেটে দিবেন । যেদিকে খুশি উড়ে যাক । আমি কাল থেকেই ওখানে আমার প্রজেক্ট শুরু করতে চাই ।

অবশেষের দিন এবং রাত্রি

সকালে আমার ঘুম ভাঙ্গল ফোনের আওয়াজে । স্ক্রিনে দেখি অচেনা নাম্বার । আলস্য নিয়ে রিসিভ করলাম ।

- হ্যালো

- আমি সেই মাতাল রাতের মেয়ে বলছি ।

আমি চুপ হয়ে গেলাম । আমি ভেবেছিলাম আমি বিভ্রান্তি কেটে উঠেছি । কিন্তু সে আবার হাজির হয়েছে।

- হ্যালো শুনতে পাচ্ছেন ?? মেয়েটা বলল আবার ।

- জি বলুন

- আমি আজ আপনাকে বিয়ে করতে চাই । জানি এটা খুব একটা আদর্শ মুহূর্ত নয় এমন প্রস্তাব দেওয়ার কিন্তু এর চেয়ে খাদহীন অনুভূতিও আর কখনও আসবে না ।

- রসিকতা করছেন ??

- না । এর চেয়ে সিরিয়াস আমি কখনও ছিলাম না। হবোও না কখনও ।

- কিন্তু সেটা কিভাবে সম্ভব ??

- কেনও সম্ভব নয়?? নাকি আপনি মন পরিবর্তন করেছেন ??

- না মন পরিবর্তন করিনি । একটা সমস্যা আছে।

- কি সমস্যা ??

- আমার ধারণা আপনি আমার কল্পনা ।

- মানে ??

- দেখুন আমি ছোটবেলা থেকে একা একা বড় হয়েছি বলে আমার অনেকরকম মানসিক সমস্যা আছে । একটা সমস্যা হচ্ছে, আমি খুবই কল্পনাপ্রবণ । আমি কিছু একটা কল্পনা করলে তাকে একদম বাস্তবের মতো দেখতে পাই । কিন্তু বাস্তবে তার অস্তিত্ব নেই । আপনার ধারণা আমার নিঃসঙ্গতা কাটানোর জন্য আমার অবচেতন মন আপনাকে তৈরি করেছে । আপনার আসলে কোনও অস্তিত্ব নেই ।

- যার এমন সমস্যা থাকে সে কিন্তু বুঝতে পারে না ।

- আমি এখনও পারছি পুরোপুরি পাগল হয়ে যাইনি বলে হয়তো । একসময় আর পারবো না ।

- কিন্তু আপনার কেনও মনে হচ্ছে আমি কল্পনা?? আপনাকে তো আমি স্পর্শও করেছি !

- সে রাতে হয়তো বাস্তব ছিলেন কিন্তু এখন কল্পনা হতে পারেন । আর তাছাড়া এর আগেও একদিন আপনি আমাকে ডেকেছিলেন , মানে আমি ভেবেছিলাম , কিন্তু আপনি আসেননি ।

- আমি এসেছিলাম ।

- জি ??

- হ্যাঁ আমি এসেছিলাম । আমি দেখতে ছেয়েছিলাম আপনি আমার প্রতি কতখানি ডেডিকেটেড । তাই আপানার সামনে আসিনি । আপনি যতক্ষণ অপেক্ষা করেছেন আমিও ততক্ষণ ছিলাম । শেষে আপনি প্রচণ্ড কষ্টে ধীর পায়ে হেঁটে গেলেন প্রায় মধ্যরাতে ।

আমি আবারও চুপ হয়ে গেলাম । কি বলবো ! অসম্ভব আশা আর নিরশার মাঝখানে আমি অসহায়বোধ করছি । মেয়েটিই আগে বলল , এবার বিশ্বাস হলো ??

- আপনি আমার ফোন নাম্বার কই পেলেন ??

- সেই মাতাল রাতে আপনিই দিয়েছিলেন । আপনার মনে নেই!

আমার আবছাভাবে মনে পরে । আমি দুরুদুরু বুকে জিজ্ঞেস করি , আর যদিও আপনি বাস্তব হয়েই থাকেন তাহলে কেনইবা আমাকে বিয়ে করবেন ?? আমি মাতাল, মানসিক রোগী ।

- আপনাকে বিয়ে করার পেছনে আমার শক্ত একটা কারণ অবশ্যই আছে ।

- কি কারণ ?

- এখন তো বলা যাবে না । যদি আপানার সাথে আমার বিয়ে হয় তাহলে বাসর রাতের কোনও এক আবেগময় সময়ে আমি বলবো ।

- ওহ

কিছুক্ষণ চুপ থেকে মেয়েটা আবার জিজ্ঞেস করে, কি আসছেন??

কি বলবো আমি ?? যদি মেয়েটা স্বপ্ন হয় তবে এরচেয়ে সুন্দর স্বপ্ন আর আসেনি আমার জীবনে । যদি বাস্তব হয় তবে এরচেয়ে অসাধারন ঘটনাও থাকবেনা আমার জীবনে । কিন্তু মেয়েটা যদি স্বপ্নই হয় তাহলে আমার কি উচিৎ হবে সে স্বপ্ন ভেঙ্গে দেওয়া ?? ওপাশের অপেক্ষা বাড়ে, বৃদ্ধি পায় আমার নীরবতা ।

২

রকিব আর মজনু নিঃশব্দে ছাদে উঠে আসে । ওদের পায়ের তলা যেনও বিড়ালের চেয়েও রেশমি । দুইজনেই আজিজ সাহেবের ভাড়াটে গুন্ডা বাহিনীর উদীয়মান মাস্তান । এই প্রথম তাদের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে । অন্যদিনের চেয়ে আজ তারা বেশি সতর্ক । যদিও কাজটা তেমন কঠিন কিছু না । শুধু ছাদের হুকের সাথে লাগানো বেলুনবাড়ির দড়িটা কেটে দিতে হবে । ধীর পায়ে তারা বেলুনের নীচে এসে দাঁড়ায় । উপরে তাকাতেই থমকে গেলো তাদের চোখ। বেলুনের মাথায় লাল নীল বাতি জ্বলছে । তারা জানে বেলুনবাড়িতে বাসর রাত হলে এই আলো জ্বলে । সাধারণত এমন রাতে সেই বাড়িতে হাত দেওয়া হয়না । রকিব মজনুর দিকে তাকায় । তাদের মাঝে কোনও কথা হয়না । এটাই তাদের প্রথম বড় কাজ । ভবিষ্যতের অনেক কিছুই নির্ভর করছে আজকের কাজের উপরে , তাই তারা ঝুকি নিতে পারে না । মজনু একটু মাথা দোলায় । তারপর দুইজনে মিলে কাটতে শুরু করে দড়ি ।

৩

“ আরে আমরা উড়ে যাচ্ছি কেনও” চমকে উঠে সেই মাতাল রাতের মেয়েটি বলে উঠলো ! আমি হাসলাম । বললাম, “নীলিমা স্কাই বিল্ডারস অনেক দিন থেকেই আমার বেলুনবাড়ি দখল নিতে চাচ্ছিলো । কিন্তু আমি দিচ্ছিলাম না । কারণ আমি ভেবেছিলাম, এই বাড়িটা ছাড়া আমাদের আর কোনও যোগাযোগের উপায় নেই । শেষমেশ ওরা আর ধৈর্য ধরল না । আজকেই দড়ি কেটে দিলো” । মেয়েটার হতভম্বভাব তখনও যায়নি । সে বলল, আমরা তো আশ্রয়হীন হয়ে গেলাম । আমি আবার হাসলাম , বললাম, আকাশের চেয়ে বড় আশ্রয় আর কি আছে । মেয়েটা চারপাশে তাকালো । আমিও তাকালাম । আমরা একটু একটু করে ভেসে যাচ্ছি । আর একটু একটু করে অন্ধকার তার গভীরে টেনে নিচ্ছে যাবতীয় অলৌকিক আলো । শূন্য স্পর্শের কিছু হাওয়া মিলে মিশে জমছে আমাদের বিছানায়। অনেকদূরে একটা তারা খসে পড়লো কারও ইচ্ছেপূরণের প্রার্থনা হতে । কিছু নাবালক সাদা মেঘ শরীর ভাসিয়ে এগিয়ে আসছে আমাদের দিকে । সমগ্র চরাচরে যেনও আর কিছু নেই ! এমন বাসররাত কি হয়েছে কখনও কারও কোনওকালে ?? আমি মেয়েটির দিকে তাকালাম । ওর ভেজা চোখের কোণায় আশ্রয় নিতে চায় শেষ রাতের মরাটে জোছনা । বোকা চাঁদ জানে না কারও অশ্রুতে জোছনার ছায়া পরে না ।

আমাদের শহরের সেই সব নাগরিক গল্পখোরেরা

১

আমাদের নগর প্রধানের হঠাৎ মনে হলো শহরে একজন গল্পখোর দরকার ।

২

নগর সভার সবাই ভাবচ্যাকা খেয়ে গেলো । গল্পখোর আবার কি ?? কেউ কখনও এমন শোনেনি । নগর প্রধান গোঁফের তলায় মুচকি হাসলেন । বললেন , গল্পখোর হলো গল্প খাদক । সবার ভ্রু প্রশ্নবোধক, নগর প্রধান আবার মুচকি হাসি দিলেন । ষড়যন্ত্র করার ভঙ্গিতে বললেন, "আমাদের সবার পেটভর্তি নানারকম গল্প । গোপন গোপন গল্প । কাউকে বলা যায় না এমন গল্প" । বলে দ্রুত নিঃশ্বাস ফেললেন নগর প্রধান, "গল্পখোরদের আমরা সে গল্পগুলোই বলবো । কিন্তু গল্পখোরেরা কাউকে সে গল্প বলতে পারবে না" । সবাই বলে উঠলো, বাহ বাহ নগর প্রধানের কি বুদ্ধি ! নগর প্রধান তৃপ্তির হাসি হাসলেন ।

৩

বিরোধী দল শুনেই আঁতকে উঠলো ! একি সর্বনাশের কথা । নগর প্রধান কি এর মাধ্যমে বিরোধী দলের গোপন পরিকল্পনা জানতে চাচ্ছে ?? তারা রাজপথ থেকে বিকেলের রোদ পড়া ছাদে আওয়াজ তুলল, এতে নগরের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ণ হবে । বাহিরের লোকেরা বলবে , এই শহরের লোকেরা গোপন কথাটি রাখতে জানে না গোপন । শহরের একদল বুদ্ধিজীবী , গাছের হলুদ পাতায় লিখলো, অতি চমৎকার উদ্যোগ । এর মাধ্যমে শহরের লোকের মানসিক শান্তি ফিরে আসবে! আরেক দল পাতার উপরে নীল রঙ দিলো । তারপরে বিকল্প প্রতিবাদী নামে লিখলো, ব্যক্তিস্বাধীনতার এমন হস্তক্ষেপ মেনে নেওয়া যায় না, শহরে বেড়ে যাবে অবিশ্বাস ! ব্যথিত, ভঙ্গুর গাছগুলো ক্লান্ত পলক মেলে দেখলো, শহরের জোকারেরা নতুন রঙ্গে মেতে উঠেছে । কেউ তা দেখছে, কেউ দেখছে না । তাতে কারই কিছু আসছে না, যাচ্ছে না ।

৪

এক শুভদিন দেখে ঘোষণা করা হলো, গল্পখোরের মনোনয়নপত্র জমা নেওয়া হবে কাল থেকে । মনোনয়নপত্র থেকে বাছাই করা হবে সাত জন প্রাথমিক গল্পখোরকে । তাদের এক মাস পর্যবেক্ষণ করে চূড়ান্তভাবে একজনকে নিয়োগ দেওয়া হবে, নাগরিক গল্পখোর । সবাই প্রবল উৎসাহে মনোনয়নপত্র যোগাড় করতে লাগলো । এমনকি বিকল্প প্রতিবাদীরাও ঘুষ দিয়ে কিনে নিলো কিছু পত্র, তারপর মুখ উদাস করে বলল, এটা তাদের নতুন ধরনের প্রতিবাদের প্রাথমিক ধাপ । এক দিনেই শেষ হয়ে গেলো সব , অন্যের গোপন কথা শোনার আগ্রহ সবারই অপরিসীম !

৫

আরেক শুভদিনে ঘোষণা করা হলো, প্রাথমিক ভাবে নির্বাচিত সাত জনের নাম । তাদের মুখে আকাশগঙ্গা জয়ী সম হাসি । জানানো হলো, কাল থেকে সাত জনের কাছে জানানো যাবে আমাদের গোপনতম গল্প । গল্পখোরদের হাসি বিস্তৃত হলো ।

৬

আমরা পরের দিন থেকে দলে দলে যেতে শুরু করলাম গল্পখোরদের কাছে । সেজে গুজে সবচেয়ে সুন্দর কাপড় পরে আমরা গেলাম আমাদের গোপন গল্পগুলো শুনাতে । তারপর লম্বা ভিড়, দীর্ঘ অপেক্ষা । সবার গল্পই অনেক বড় । অপেক্ষা আমাদের ক্লান্ত করে কিন্তু ফিরিয়ে নেয় না । আস্তে আস্তে সেখানে এসে গেলো পাখার ব্যবসায়ী , পানির ব্যবসায়ী, খাবারের ব্যবসায়ী । হরেকরকম প্রয়োজনে হরেকরকম সমাধান । শহর যেনও মেলার শহর । নগর প্রধানের কোষাগার ভরে উঠছে তাই তিনি তৃপ্ত । বিরোধী দল সেই কোষাগার দেখে শঙ্কিত । আর আমরা আমাদের গোপনতম কথাটি সুযোগ মতো উগড়ে দিয়ে মুক্তো , হঠাৎ স্বাধীন হয়ে যাওয়ার মতো আনন্দিত ।

৭

কিন্তু আমাদের গল্পখোরদের দিকে আমরা অবাক তাকিয়ে রই। যত দিন যাচ্ছে তারা তত নিস্তেজ হয়ে যাচ্ছে । ক্লান্তি তাদের চোখজুড়ে । ফ্যাকাসে চামড়ায় কিসের যেনও আকুতি । নির্মম আর্তনাদ প্রতিটা পায়ের পদক্ষেপে । তাদের জন্য মেডিক্যাল বোর্ড বসলো , শহরে গুজব, মানুষের গোপন কথা গোপন

রাখার চাপে তাদের এই পরিণতি । তবে গল্প খাওয়া থামলো না । গল্প শেষে আমরা সুখী হয়ে বের হয়ে আসি । আর গল্পখোরেরা আরও বিবর্ণ হয় । এমনকি শহরের সেরা মেকআপ বিশেষজ্ঞরাও তা লুকাতে পারে না । অথচ আমাদের গল্প ফুরায় না ।

৮

অবশেষে এলো সেই দিন । ঘোষণা হবে, নগরের প্রথম নাগরিক গল্পখোর । নগর প্রধান এসে দাঁড়ালেন নগরের সবচেয়ে উঁচু জায়গায় । তিনি বললেন, কিভাবে তিনি ভাবলেন, একজন গল্পখোরের কথা । আমরা তার বুদ্ধির প্রশংসা করলাম । তিনি দুঃখ ভরা কণ্ঠে বললেন, কতভাবে বাঁধা দেওয়া হয়েছে । আমরা দুঃখিত হলাম । তিনি বললেন, আমাদের সুখী মুখ দেখে তিনি কত সুখী । আমরা অপেক্ষা করি। সবশেষে নগর প্রধান বললেন , তিনি প্রত্যেক গল্পখোরের কাজেই সন্তুষ্ট । তাই জনগণের চাহিদা অনুসারে সাতজনকেই নাগরিক গল্পখোর ঘোষণা করা হলো । আমরা আনন্দধ্বনি করে উঠলাম । আর গল্পখোরেরা করে উঠলো আর্তনাদ ! আমরা অবাক হয়ে তাদের দিকে তাকাই । নগর প্রধান বিরক্ত হলেন । তিনি জোরে জোরে হেসে বললেন, ফুর্তি ফুর্তি ! আমরাও দুই হাত তুলে বললাম, ফুর্তি ফুর্তি ! আমাদের সম্মলিত উচ্ছ্বাসের নিচে চাপা পরে গেলো গল্পখোরদের অস্ফুটতা ।

৯

পরের দিন সকালে ঘুম থেকে উঠে আমরা চমকে গেলাম । শুনলাম, গতরাতে আমাদের নাগরিক গল্পখোরেরা একসাথে আত্মহত্যা করেছে !

এক ঈদ সংখ্যায় জনৈক রিক্সাওয়ালার সাক্ষাৎকার

একজন শৌখিন লেখক

রফিকুল সাহেব বিমর্ষমুখে অফিসে বসে আছেন । আজ "দৈনিক শেষ অন্ধকার" পত্রিকার ঈদ সংখ্যায় গল্প জমা দেওয়ার শেষ দিন অথচ তিনি একটা শব্দও লিখতে পারেননি । তিনি একজন শখের গল্প লেখক। তার বেশ কিছু গল্প পত্রিকায় ছাপা হয়েছে । তিনি ভেবেছিলেন এইবার ঈদ সংখ্যায় গল্প ছাপিয়ে সহকর্মীদের তাক লাগিয়ে দিবেন। কিন্তু অতি চেষ্টার ফলেই কিনা তার মাথায় কোনও গল্পই আসছে না। তিনি চরম বিরক্তি নিয়ে তার টেবিলের নিচে লুকিয়ে রাখা ছোট্ট টিভিটার দিকে তাকালেন । সেখানে "চ্যানেল খাড়া নাক" এ ঈদ অনুষ্ঠানের বিজ্ঞাপন দেখাচ্ছে , "কৃষকের ঈদ আনন্দ" । তিনি ভাবলেন, শহরের মানুষেরা গ্রামের মানুষদেরকে অতি দরিদ্র মনে করে। দরিদ্র মানুষের আনন্দ দেখে তারা পুলকিত হয় । এটা ভাবতেই তার মনে হল তিনি তো রিক্সাওয়ালাদের ঈদ আনন্দ নিয়ে লিখতে পারেন ! সাহিত্য সম্পাদকেরা নিম্নবিত্তের গল্প বিশেষ পছন্দ করেন । আইডিয়া মাথায় আসতেই রফিকুল সাহেব উত্তেজিত হয়ে পড়লেন । তিনি ঠিক করলেন এখুনি একজন রিক্সাওয়ালার সাথে কথা বলে গল্প লিখে ফেলবেন। অফিস থেকে বের হতে হতে গল্পের নামও ঠিক করে ফেললেন, "জৈনক রিক্সাওয়ালার ঈদ সাক্ষাৎকার" ।

সাক্ষাৎকার পর্ব

অফিসের সামনে চায়ের দোকানে বসে আছেন রফিকুল সাহেব । তার হাতে একটা ছোট নোটবই । সামনে একজন রিক্সাওয়ালা । বয়স ৩০/৩২, চেহেরায় একটা বেপরোয়া ভাব। রফিকুল সাহেব ভাবলেন, প্রথমে নাম জিজ্ঞাসা করবেন। পরে ভাবলেন তার গল্পের জন্য নামের দরকার নেই। তিনি কলমের ক্যাপ খুলতে খুলতে জিজ্ঞাসা করলেন, আপনার কাছে ঈদ মানে কি?? রিক্সাওয়ালা বুঝতে না পেরে চুপ করে তাকিয়ে থাকল। রফিকুল সাহেব বুঝলেন প্রশ্ন ভুল হয়েছে। তিনি আবার জিজ্ঞাসা করলেন, ঈদের দিন আপনি কি করবেন?? রিক্সাওয়ালার মুখে এইবার হাসি ফুটল। বলল, নামাজ পরবো, খানা খাবো , রিক্সা নিয়া বাহির হব । রফিকুল সাহেব ভ্রূ কুচকালেন । এগুলান লিখলে পাবলিক খাবে না। তিনি ভিন্ন পথে চেষ্টা শুরু করলেন। জিজ্ঞাসা করলেন, সিনেমা দেখবেন না?? রিক্সাওয়ালার হাসি চওড়া হলো, বলল, জে দ্যাখবো শাকিব খানের ছিনেমা দ্যাখবো । রফিকুল সাহেবের মুখেও এইবার হাসি ফুটল । তিনি জানেন নাক উঁচু মধ্যবিত্তদের ধারণা বাংলা সিনেমা

রিক্সাওয়ালাদের জন্য বানানো হয়। এই ধারনার অকাট্য প্রমান পেলে পাঠক তৃপ্তি পাবে। তিনি নোটবুকে লিখলেন, জৈনক রিক্সাওয়ালার কাছে ঈদ মানেই বাংলা সিনেমা ...

পরের প্রশ্নে রফিকুল সাহেব জিজ্ঞাসা করলেন, ঈদ নিয়ে আপনার কোনও স্মরণীয় ঘটনা? রিক্সাওয়ালা বুঝতে না পেরে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকল । রফিকুল সাহেব বুঝতে পেরে জিজ্ঞাসা করলেন, ঈদের দিনে ঘটা এমন কোনও ঘটনা যা এখনও আপনার মনে পড়ে । রিক্সাওয়ালা এইবার বলল, অ্যাকবার ঈদ হইসিলো শীতের টাইম । আমি সকালে গোছল করবার পারি না। আম্মাক বল্লাম, পানি গরম করতে । আমার অভ্যাছ হল আগে লুঙ্গিত পানি দিয়া পরে গায়ত পানি দিয়া। তো আম্মা পানি গরম করি দিছে । পানি অত্তধিক গরম হছে এটা আম্মাও কয় নাই, আমিও খিয়াল করি নাই । অভ্যাস মত গরম পানি দিছি লুঙ্গির ভিতর...তারপর মারও বাপরো বলি চিৎকার ... রফিকুল সাহেব থমকালেন। লুঙ্গির ভিতর পানি দেওয়ার কথা লিখা যাবে না। পাঠকের সুরুচিতে আঘাত লাগতে পারে । তিনি লিখলেন , গায়ে পানি ঢালতেই চিৎকার দিয়ে উঠলাম । তারপর যেমনটা বলা হয়, ইতিহাস ।

“ঈদের দিনে কি খাবেন??” প্রশ্ন করেন রফিকুল সাহেব । রিক্সাওয়ালা বলল , খিছুরি আর গরুর গোছতো । একজন দরিদ্র রিক্সাওয়ালা শখ করে খিচুড়ি আর গরুর মাংস খাচ্ছে এটা পাঠকের পক্ষে হজম করা কঠিন। তারা ভাবতে পছন্দ করে, ঈদের দিন গরিবের ঘরে খাবার নেই, এটা ভেবে আহ উহ করতেও তারা পছন্দ করে । তিনি ভাবলেন এখানে জিনিসপত্রের দাম নিয়ে রিক্সাওয়ালা সরকারকে গালাগালি করছে এটা দেখাতে হবে। সরকারকে গালাগালি করা একটা হিট আইটেম। সিনেমাওয়ালাদের ভাষায়, অলটাইম হিট । বাঙ্গালিরা কারণে অকারনে সরকারকে গালি দেয়। তারা এটাকে নাগরিক অধিকার মনে করে। বাঙ্গালির অবসর বিনোদনের উপর যদি কোনও জরিপ হত তাহলে সরকারকে গালি দেয়া বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জিতে যেত । রফিক সাহেব মন্তব্য করেন, জিনিসপত্রের যা দাম! রিক্সাওয়ালা বলে ওঠে, হয় গরিবের কি আর ভালো মন্দ খাওয়ার উপায় আছে! সাথে সাথে রফিক সাহেব লিখে ফেললেন, ঈদের দিন কি খাবেন জিজ্ঞাসা করায় রিক্সাওয়ালা উত্তেজিত হয়ে বলে সরকার কি গরিবের কথা ভাবে যে তারা ঈদে খাওয়া দাওয়া করবে?? তারা তো তালা চাবি নিয়া ব্যাস্ত.....

রফিকুল সাহেবের চতুর্থ প্রশ্ন, ঈদে কি কাপড় কিনলেন?? রিক্সাওয়ালা বলল, আমার লাইগা কিছু কিনি নাই, তয় মাইয়াটার লাইগা এক খান করিনা লেঙ্গা কিনছি । ৪০০ টিকা দিয়া । রিক্সাওয়ালার মুখে কারিনার লেহেঙ্গার বিকৃত রুপ শুনে পাঠক যথেষ্টই মজা পাবে। কিন্তু ৪০০ টাকা দিয়ে কিনেছে এটা তারা বিশ্বাস করবে না। রফিকুল সাহেব ভাবলেন, দাম কমিয়ে ৭০/৮০ টাকা করে দিবেন ।

এটাও খুব বিশ্বাসযোগ্য না। কিন্তু মাত্র ৭০/৮০ টাকায় একটা লেহেঙ্গা পাওয়া যাচ্ছে এটা পড়ে পাঠক আমোদিত হবে বৈকি ।

রফিকুল সাহেব ঘড়ির দিকে তাকালেন । তারপর বললেন, শেষ প্রশ্ন রাতের বেলা কি করবেন? রিক্সাওয়ালা একটু উদাস হয়ে বলল, বউ এর লগে একটু ভাব ভালোবাসা করমু। রফিকুল সাহেব একটু চমকে উঠলেন। এই উত্তর পাবেন তিনি ভাবেননি । তার খুব ইচ্ছে হল , রিক্সাওয়ালা ও তার বউ এর ভাব ভালোবাসার একটা রগরগে বর্ণনা দেন। কিন্তু সেটা সম্ভব না । বাঙালি পাঠকের কাছে সাহিত্যে প্রকাশ্যে ভাব ভালোবাসার রগরগে বর্ণনা অস্পৃশ্য অশুচি । রগরগে গল্প তারা লুকিয়ে গোপনে পড়তে পছন্দ করে। তিনি তাই আবারও ভিন্ন পথ ধরলেন, জিজ্ঞাসা করলেন আপনার প্রিয় নায়িকা কে? রিক্সাওয়ালা বলল, অপু বিশ্বাস। রফিকুল সাহেব আবার জিজ্ঞাসা করেন, তাকে স্বপ্নে দেখতে চান। রিক্সাওয়ালা হেসে বলল, জে চাই। রফিকুল সাহেব লিখলেন, একটা চমৎকার দিনের নিখুঁত সমাপ্তি দিতে জৈনক রিক্সাওয়ালাটি চান একটা স্বপ্ন দেখতে যেখানে তার পাশে থাকবে অপু বিশ্বাস.....

রফিকুল সাহেব ভাবলেন যথেষ্ট হয়েছে। এটা নিয়েই তিনি একটা রসালো গল্প ফেঁদে ফেলবেন। তিনি উঠে দাঁড়ালেন। তারপর মানিব্যাগ থেকে একটা দশ টাকার নোট বের করে রিক্সাওয়ালার দিকে এগিয়ে দিলেন। রিক্সাওয়ালা অবাক হয়ে বলল, এতক্ষণ বসায় রাইখা মাত্র দশ টিকা । রফিকুল সাহেব ভ্রূ কুঁচকে বললেন, তো কত দিতে হবে? বসায় তো রাখসি আর কিছু তো কিছু করাই নাই! রিক্সাওয়ালা ক্ষেপে যেয়ে বলল, এতক্ষণ রিশকা চালাইলে ৫০/৬০ টিকা পাইতাম। আপনের বিচার নাই??

- আরে বসায়ে রেখে কত টাকা দিতে হবে হাহ?? এত বকিস না! দশ টাকা নিলে নে নাহলে ভাগ...

- নিমুনা দশ টিকা। টিকা আপনার *** ** *** রাখেন।

- কি!!! কি বললি তুই ??

- বলছি টাকা আপনার *** ** *** রাখেন ।

রফিক সাহেব আর রিক্সাওয়ালাকে ঘিরে ততক্ষণে লোক জমে গেছে। ভিড়ের মধ্যে থেকে একজন এগিয়ে এসে বলল, ওই ভদ্রলোকের সাথে ভদ্রভাবে কথা বল। রিকশাওয়ালা আর ক্ষেপে গিয়ে বলল, আমি ভদ্রলোকের ******। এই কথা শুনে ভিড় উত্তেজিত হয়ে ওঠে আরও। আগের লোকটা আবার বলল, *** ছোটলোকের মুখে এত বড় কথা। রিক্সাওয়ালার মাথায় যেন কিছু ঢুকছে না। সে বলেই চলে, আপনারা আমাগো যেভাবে খুশি **** আর আমরা কিছু কইলেই দোষ?? আপনারা তো আরও *****। এক ছোটলোক পুরো ভদ্র সমাজ কে যা ইচ্ছা বলে গালি দিবে আর ভদ্রসমাজ সেটা মেনে নিবে তা তো হতে পারেনা। সুতরাং উপস্থিত ভদ্রসমাজ ছোটলোক রিক্সাওয়ালার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল এবং কিল ঘুষি লাথি মেরে বুঝাতে লাগলো ভদ্রসমাজের সমাজের সাথে খারাপ ব্যাবহারের পরিণাম কি হতে পারে !

অন্তিম দৃশ্য

রিক্সাওয়ালা দুমড়ে মুচড়ে মেঝেতে পড়ে আছে। একটু আগের তেজ আর নেই তার মধ্যে। তীব্র অপমান আর ব্যাথায় নড়ার শক্তিটাও শেষ হয়ে গেছে। সে কোনওমতে বলছে, আর করমু না আমারে মাফ দেন। কিন্তু তার ক্ষীণ কণ্ঠস্বর উত্তেজিত জনতার কাছে পৌঁছায় না। প্রতি মুহূর্তে নিত্য নতুন জায়গায় আঘাত লাগছে তার। ব্যাথায় চোখ দিয়ে পানি বেরিয়ে আসে। আহ কি কষ্ট! আচ্ছা তারা কি তাকে মেরে ফেলবে?? প্রচণ্ড ভয়ে রিক্সাওয়ালার শীত লাগতে থাকে। বিড়বিড় করে বলতে থাকে , পানি খামু পানি খামু। এমন সময় একটা লাথি এসে পড়ে তার মুখের উপর। হঠাৎ করেই যেন সব ব্যাথা নাই হয়ে যায় তার। শুধু একটা ভোঁতা অনুভূতি জেগে থাকে। মুখের ভেতর ভরে ওঠা রক্ত গিলে গলা ভেজানোর আপ্রান চেষ্টা করতে থাকে সে.....

পরিশিষ্ট

রফিকুল ইসলামের লেখা “জৈনক রিক্সাওয়ালার ঈদ সাক্ষাৎকার” গল্পটি “দৈনিক শেষ অন্ধকার সাহিত্য পুরস্কার” পায়। সূক্ষ্ম রসবোধের সাথে গভীর জীবনবোধের মধ্য দিয়ে লেখক যে একটি দরিদ্র পরিবারের ঈদ উদযাপনের ছবি এঁকেছেন তাতে সাহিত্য সমালোচক সম্প্রদায় মুগ্ধ হয়ে যান। পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে রফিকুল ইসলাম তার প্রতিক্রিয়ায় বলেন, “আমার অলস ভাবনার এক কাল্পনিক সাক্ষাৎকার এতোটা সমাদৃত হবে আমি ভাবতে পারিনি। আমি এই জন্য কৃতজ্ঞতা জানাতে চাই আমার পরিবার বন্ধু ও সহকর্মীদের”। এরপর তিনি পুরস্কারের ক্রেস্ট ও পঁচিশ হাজার টাকার চেকটা দেখিয়ে বলেন, “আমি এসবের জন্য লিখি না। আমি শুধু চাই সবাই দরিদ্রদের দিকে মমতার হাত বাড়িয়ে দিক, সবাই সবাইকে প্রাপ্য মর্যাদা দিক”।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত দর্শক শ্রোতা তুমুল করতালি দিয়ে তার এই বক্তব্যকে স্বাগত জানায়।

একজন ডাকপিয়ন ও আমি

১

আমার সাথে মুনির ভাই'র পরিচয় হওয়া একরকম বিস্ময়ই বলা যায়। আমরা মুনির ভাইকে আমরা সন্ন্যাসী মনে করতাম। আমাদের পাড়ার এক খুপরি ঘরে থাকতেন উনি। তার জিবন ছিল অদ্ভুতরকম আর রুটিনে বাঁধা। তিনি প্রতিদিন সকালে সাইকেল নিয়ে বের হতেন। এবং সোজা অফিসে চলে যেতেন। উনি ছিলেন ডাকপিয়ন। সারাদিন চিঠি বিলি করার পর বিকেলবেলা আমাদের খেলার মাঠটায় এসে বসতেন। মাগরিবের আজান দেয়ার পর মতি ভাই'র চা এর দোকানে। সেখানে ২/৩ কাপ চা খেয়ে একটা পত্রিকা হাতে সোজা বাসায়। তারপর আবার পরেরদিন সকাল। তিনি কখনও নিজে থেকে কারও সাথে কথা বলতেন না। তবে কেউ কিছু জিজ্ঞাসা করলে হেসেই জবাব দিতেন। ছুটি ছাটায় কাঁধে একটা ব্যাগ ঝুলিয়ে কোথায় যে চলে যেতেন। আমরা কোনওদিনও তার কাছে কোনও আত্মীয় স্বজনকে আসতে দেখিনি। সুতরাং এমন চাল চুলোহীন মানুষকে সন্ন্যাসী ভাবার মাঝে অস্বাভাবিক কিছু ছিল না। তার প্রতি আমাদের এক ধরনের ঈর্ষাও ছিল। কারন পাড়ার মেয়েরা মুনির ভাই'র প্রতি তুমুল কৌতূহলবোধ করত। আমরা যেখানে নিত্যনতুন চুলের কাটিং আর অত্যাধুনিক কাপড় চোপড় পরেও মেয়েদের আকৃষ্ট করতে পারছিলাম না, সেখানে একজন লোক কিছু না করেই এত জনপ্রিয় সেটা মেনে নিতে আমাদের যথেষ্টই কষ্ট হত। সুতরাং আমরা নিয়মিতভাবে মুনির ভাই'র খুত বের করতাম এবং তাকে ধুমসে গালাগালি করতাম।

এইরকমই এক বিকেলে যখন আমরা মুনির ভাই'র নানা খুত বের করে তাকে গালাগালি করছি, তিনি আমাদের কাছে এসে, আমাকে বললেন, তোমার সাথে একটু কথা আছে। এই প্রথম তিনি কারও সাথে নিজে থেকে কথা বললেন! এই বিরল সম্মানে যখন আমার কিংকর্তব্যবিমুঢ় অবস্থা, কি বলব বুঝতে পারছিনা, তখন তিনি এ আবার বললেন, আচ্ছা আজ থাক। কাল বিকেলে এসো। বলেই তিনি চলে গেলেন। আমাদের হতভম্ব ভাবটা দ্রুতই কেটে গেল এবং আমরা তার এই রহস্যময় আমন্ত্রনের কারন খুঁজতে লাগলাম। অনেক গবেষণার পর আমরা সিদ্ধান্ত নিলাম, লোকটা একটা পিশাচ। সে আমকে বাসায় নিয়ে গিয়ে কেটেকুটে খেয়ে ফেলবে। সুতরাং আমি তার বাসায় যাচ্ছি না।

কিন্তু লাভ হলো না। পরের দিন মুনির ভাই নিজেই এসে আমাকে নিয়ে গেলেন তার ঘরে। কেমন যেন গুমোট একটা ভাব তার ঘরের মধ্যে। একটা খাট একটা চেয়ার একটা টেবিল আর একটা অগোছালো আলনা। এই তার ঘরের আসবাব। মুনির ভাই আমার দিকে এক কাপ চা এগিয়ে দিয়ে বললেন, তুমি তো আমাদের পাড়ার একমাত্র লেখক। একজন লেখকের সাথে বসে চা খাচ্ছি ভাবতেই কেমন লাগছে। আমি মুনির ভাই'র কথায় লজ্জা পেলাম। পত্রিকায় আমার দুই একটা লিখা ছাপা হয়েছে বটে কিন্তু সেটা নিশ্চয়ই এমন কোনও বড় বিষয় নয়। তবে মুনির ভাই সেটা জানল কিভাবে?? আমি তাই একটু অবাক হয়েই বললাম, আপনি জানেন কিভাবে?? মুনির ভাই রহস্যময় হাসি হাসেন (ওনার হাসি দেখে আমার ক্ষীণ সন্দেহ হল আমরা ওনার সম্পর্কে কি বলি সেটাও বুঝি উনি জানেন)। উনি চা এর কাপে আরেকটা চুমুক দিয়ে বললেন, আমার একটা কাজ করে দিবে??

- জি বলুন
- আমাকে একটা চিঠি লিখে দিবে??
- জি দিবো। কিন্তু কাকে??
- একটা মেয়েকে।

(আমি মনে মনে দুইটা ডিগবাজি দিলাম। পাইছি তোমারে ... তলে তলে তাহলে এই ব্যাপার)

- জি কোনও অসুবিধা নেই। আমার বন্ধুদের প্রেমপত্র তো আমি এ লিখে দেই।
- না! না! প্রেমপত্র তো না।
- তাহলে!?

এইবার মুনির ভাই খানিক ইতস্তত করেন। চা এর কাপে শেষ চুমুকটা দিয়ে বলেন, আমি যখন চিঠি বিলি করতে যাই তখন প্রায়ই একটা মেয়ের সাথে দেখা হয়। মেয়েতার বয়স বেশি না। ৮/৯ বছর হবে। ফুটফুটে পরির মত দেখতে। আমার কাছে সবসময় এসে জিজ্ঞাসা করে ওর বাবার চিঠি আছে কিনা। কিন্তু কোনও দিনই থাকেনা । ও প্রতিবারই মন খারাপ করে চলে যায়। খুব খারাপ লাগে আমার এটা দেখে। তাই ঠিক করেছি আমিই ওর বাবার মত চিঠি দিবো। কিন্তু আমি তো ভাল লিখতে পারি না। তাই তোমাকে বলা। তুমি কি লিখে দিবে??

এতক্ষণ আমি অবাক হয়ে মুনির ভাই'র কথা শুনছিলাম। নতুন এক মুনির ভাইকে আবিস্কার করে আমি অভিভুত হয়ে পড়েছি। তার কথা শেষ হতেই বললাম, অবশ্যই লিখে দিবো। মেয়েটার নাম কি?

- মায়া
- ওর বাবা কোথায় থাকে জানেন??
- হা মালয়েশিয়া।

- ঠিক আছে আমি কালই লিখে দিবো। মুনির ভাই বললেন, তুমি কাউকে বলো না এসব কথা। আমি কথা দিলাম বলবো না। একটা ঘোরের মধ্য দিয়ে আমি ঘর থেকে বেরিয়ে এলাম। তারপর অনেক ভেবে লিখতে শুরু করলাম,

"আমার ছোট্ট সোনা..."
আর এই ভাবেই মুনির ভাই'র সাথে জড়িয়ে পরলাম আমি।

২

পরের সপ্তাহেই মায়ার চিঠি এল। মায়া নিজেই মুনির ভাইকে দিয়েছে পোস্ট করার জন্য। মুনির ভাই আমাকে চিঠি এনে দিলেন। আমি জবাব লিখে দিলাম। ধীরে ধীরে মুনির ভাই'র সাথে আমার ঘনিষ্ঠতা বাড়তে লাগল। আস্তে আস্তে আমি মুনির ভাই সম্পর্কে জানতে লাগলাম। উনি কখনই ওনার মা বাবাকে দেখেননি। এক নিঃসন্তান ইমাম সাহেবের কাছে উনি মানুষ। ইমাম সাহেব কখনও তার মা বাবার কথা তাকে বলেননি। কেন বলেননি সেটাও মুনির ভাই জানেন না। তবে নিজে নিজেই খোঁজ বের করার চেষ্টা করেছেন, লাভ হয়নি। ইমাম সাহেবের বউ, যাকে উনি মা ডাকতেন, তিনি মারা যান ক্লাস ৮ এ পরার সময়। চাকুরি পাওয়ার কিছুদিন পর ইমাম সাহেবও মারা জান। বিয়ে থা করেননি। ত্রিকুলেও কোনও আত্মীয় স্বজন নেই। আর চুপচাপ স্বভাবের কারনে বন্ধু ও নেই তেমন। তাই ছুটির সময় ইমাম সাহেবের পৈত্রিক ভিটায় কাটিয়ে আসেন। তবে মুনির ভাই'র সাথে আমার ঘনিষ্ঠতা অনেকের কাছেই ভাল ঠেকল না। আমাদের পারায় মুনির ভাই যেহেতু রহস্য মানব হিসেবে পরিচিত, তাই তার সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব অনেকের কাছেই অসৎ সঙ্গ মনে হল। বাবা মা পর্যন্ত পৌঁছে গেলো আমার সর্বনাশের কথা। তবুও আমি মুনির ভাইকে ছাড়লাম না। এই চির দুঃখী, নিঃসঙ্গ মানুষটার ভিতরে যে কোমল একটা হৃদয় আছে তার আকর্ষণ আমাকে বারবার তার কাছে নিয়ে যেত। তবে মজার ব্যাপার হল আমি পাড়ার নারী মহলে বেশ জনপ্রিয় হয়ে উঠলাম। সবাই আমাকে ডেকে জানতে চান মুনির ভাই'র কথা। সবাই তার রহস্য'র সমাধান চান। আমি এটা সেটা বলে কাটিয়ে দেই। তাতে তারা সন্তুষ্ট হন না। কিন্তু আমিই বা কি বলতে পারি?? তার সব রহস্যর সমাধান এমন কি আমার কাছেই বা আছে??

৩

এই যেমন মায়া নামের মেয়েটির কথাই বলি। যে মেয়ের সাথে তার কোনও আত্মীয়তা নেই, কোনও ধরনের কোনও সম্পর্কই নেই, সেই মেয়েটার প্রতি ভাইয়ার এত মমতা কেন?? আজ প্রায় এক বছর হল মুনির ভাই যেন মেয়েটির অঘোষিত পিতা। মেয়েটা যদি লিখে, একটা পুতুল দেখে তার খুব ভাল লেগেছে পরের চিঠির সাথে মুনির ভাই তাকে পুতুল পাঠিয়ে দেন। হয়ত মেয়েটা লিখল চকলেট খেতে

ইচ্ছে করছে তাহলে পরের চিঠিতে চকলেট পাঠিয়ে দেন। এইভাবেই মেয়েটার অজান্তেই মেয়েটার সব চাহিদা পুরন করে চলেছেন তিনি কোনও প্রকার চাওয়া ছাড়াই, ক্লান্তিবিহিন। অথচ মেয়েটার সাথে তার তেমন কোনও কথা হয় না। শুধু চিঠি আদান প্রদানের সময় এ হয়ত ২/১টা বাক্য বিনিময় হয়! কিন্তু তার কথা বলার সময় মুনির ভাই যেন ঘোরের মধে চলে যান। মেয়েটার সবকিছুই যেন মুনির ভাই'র মুখস্ত। সে কিভাবে হাসে, কিভাবে কথা বলে, কিসে খুসি হয়, কোন পোশাকে তাকে কেমন দেখায় আসব নিয়ে মুনির ভাই'র গবেষণার অন্ত নেই। আমি দেখি আর অবাক হই...কেউ কি কাউকে কখনও এতটা নিঃস্বার্থভাবে ভালবাসতে পারে...

তারপর একদিন হঠাৎ করেই বদলে যায় সব কিছু...

৪

সেদিন ছিল প্রচণ্ড বৃষ্টি। আমি সন্ধ্যাবেলা ভিজতে ভিজতে মুনির ভাই'র রুমে ঢুকি। দেখি উনি কাঁথার ভেতরে শুয়ে যন্ত্রণায় কাৎরাচ্ছেন। আমি দৌড়ে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম কি হয়েছে?? উনি জবাব দিলেন না। আমি ওনাকে টেনে বিছানায় বসালাম। দেখি হাতে ব্যান্ডেজ। মুখে কালশিটে দাগ। আমি আবার জিজ্ঞাসা করলাম কি ঘটনা। উনি মাথা নিছু করে জবাব দিলেন, মায়ার বাবা ফিরে আসেছেন! আমি চমকে গেলাম। চুপ করে তাকিয়ে থাকলাম তার দিকে। কিছুখন পর নিজে থেকেই বলতে শুরু করলেন, কয়েক দিন আগেই মায়ার বাবা ফিরে এসেছে। তার সাথে তার দ্বিতীয় বউ। মালায়শিয়াতে যেয়ে ওখানকার এক মেয়ে বিয়ে করেন উনি। তাই মায়া বা ওর মা'র কোনও খোঁজ নেননি এতদিন। এখন এখানকার জমি বিক্রি করে দিতে দেশে এসেছেন। স্বামীর দ্বিতীয় বউ দেখেই মায়ার মা'র মাথায় আকাশ ভেঙ্গে পরে। সে মুনির ভাই'র মায়াকে লিখা চিঠিগুলো বের করে দেখায়। কিন্তু হিতে বিপরিত হয়। মায়ার বাবা উলটা ওর মা'কে পরকিয়ার অপবাদে তালাক দিয়ে বাড়ি থেকে বের করে দেয়। আজ মুনির ভাই চিঠি নিয়ে গেলে মায়ার বাবার হাতে ধরা পরেন। তারপর তিনি মুনির ভাইকে মারধর করেন! পাড়ার লোকেরা এসে তাকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যায়। সেখানেই তিনি সব কাহিনি শোনেন। আমি স্তব্ধ হয়ে দাড়িয়ে থাকি। তাকিয়ে থাকি বহু কষ্টে চোখের পানি আটকে রাখা মুনির ভাই'র দিকে। হঠাৎ আমার কি হয় আমি যেয়ে মুনির ভাইকে জড়িয়ে ধরি। মুনির ভাই যেন এর অপেক্ষাতেই ছিলেন। হুরমুর করে কেঁদে ফেললেন উনি। তার চোখের জলে ভিজে যাচ্ছে আমার শার্ট। উনি বিড়বিড় করে বলছেন, আমার মায়াকে কোথায় পাব?? আমার মায়াকে কোথায় পাব!! তুমি আমার মায়াকে এনে দাও, একবার এনে দাও...।উনার আর্তনাদ আমার বুক ভেঙ্গে দিচ্ছিল তবুও শক্ত করে ধরেছিলাম তাকে। সারা জীবনের বাচাল আমিও তখন চুপ। কিন্তু তখনও আমি জানতাম না এটাই আমাদের শেষ দেখা।

৫

পরের দিন সকাল থেকেই আর মুনির ভাই কে দেখা যায়নি । এমন কি ওনার আসবাব ঘরে পরে থেকেছে দিনের পর দিন কেউ খোঁজ নিতে আসেনা।এক সময় বাড়িওয়ালা ওই ঘরকে ভুতের ঘর ঘোষণা দিয়ে ঘর ভেঙ্গে ফেললেন, তারপর নতুন ভাড়াটিয়া আসলো সেই ঘরে। আস্তে আস্তে সবাই ভুলে গেলো মুনির ভাই'র কথা। এমন সময়ই হঠাৎ একদিন আমার কাছে মুনির ভাই'র চিঠি আসলো। আমি অস্থিরের মত খুলে দেখি, লিখা... " তোমাকে না জানিয়ে চলে এসেছি বলে রাগ করেছ?? রাগ করো না ভাই। আর কেউ বুঝলেও তুমি যে আমার কথা বুঝবে আমি জানি। তুমিই যে আমার সার জীবনের একমাত্র বন্ধু ছিলে। আমার এক মাত্র ভাই। আমি হয়ত তোমাকে বলেই আসতাম, কিন্তু আমার মাথার ঠিক ছিল না তখন। পাগলের মত বেরিয়ে পরেছিলাম মায়ার খোঁজে। আসলে সার জীবনই আমি নানাভাবে কষ্ট পেয়ে এসেছি। কখন কিছু আকান্ত নিজের করে পাইনি। এমনই দুর্ভাগা আমি যে নিজের পরিচয়ই জানিনা। তাই বারবার চেয়েও অনেক কিছুই পাওয়া হয়নি আমার। কষ্ট পেয়ে অভিমান করে নিজেকে দূরে সরিয়ে নিয়েছি সব কিছু থেকে। ধরেই নিয়েছি সবই আমার নিয়তি। কিন্তু সেদিন তুমি চলে যাওয়ার পর আমার মনে হল কেন বারবার আমিই হেরে যাবো নিয়তির কাছে। কেন বারবার আমিই কষ্ট মেনে নিব। মায়া তো আমার কলিজার একটা অংশ, ওর জন্য কেন আমি নিয়তির সাথে যুদ্ধ করব না?? তাই পরের দিন ভরেই আমি নেমে পড়েছি ওর খোঁজে। চাকরিটা ছেড়ে দিয়েছি। যখন যেখানে যাই তখন সেখানে কাজ খুজে নেই। রিকশা চালান থেকে শুরু করে মাটি কাটা সব কাজই করছি শুধু মায়াকে ফিরে পাবার জন্য। আমি জানি প্রয়োজনে দেশের প্রতিটা শহরে যাবো, প্রতিটা গ্রামে যাবো তবুও ওকে আমি খুজে বের করব...করবই একদিন..."

৬

তারপরেও কেটে গেছে বহুদিন। আমি আর মুনির ভাই'র খোঁজ পাইনি। কিন্তু এখনও পোস্ট অফিসের সামনে দিয়ে গেলে উকি দেই। রাস্তায় হলুদ উইনিফরম দেখেলেই মুখটা ভাল করে দেখি। যদি আরেকটিবার মুনির ভাই'র দেখা পাওয়া যায়!!! না আমি জিজ্ঞেস করতাম না উনি মায়াকে খুঁজে পেয়েছেন কিনা শুধু একবার হাত ধরে বলতাম, মানুষ সারা জীবন একজন বিস্ময় মানুষ খোঁজে। বেসিরভাগই পায়না। কিন্তু আমি ভাগ্যবান আমি আপনার দেখা পেয়েছিলাম কোনওকালে। কিন্তু আমার অপেক্ষা আর ফুরায় না।

আসলে কিছু অপেক্ষা কখনও ফুরাবেনা জেনেই শুরু হয়। কিছু গল্পের সমাপ্তি থাকেনা বলেই লিখা হয়.....

একজন ব্যর্থ মানুষের অপেক্ষা

১

আমি একজন ব্যর্থ মানুষ ।

একজন মানুষের পক্ষে যতভাবে ব্যর্থ হওয়া সম্ভব আমি সব ভাবেই ব্যর্থ । অথচ আমার যখন জন্ম হয় তখন পুরো পরিবারেই আনন্দের ঢল নেমেছিল । আমার দরিদ্র বাবা তার সামর্থের বাহিরে গিয়ে পুরা এক মাসের বেতন দিয়ে মিষ্টি কিনে বিতরন করেছিলেন । তার আশা ছিল ছিল একদিন বড় হয়ে পড়াশুনা করে তার দারিদ্রের জীবন থেকে আমি মুক্তি দিব। কিন্তু তার প্রথম আশাভঙ্গ হয় যখন আমি ম্যাট্রিক পরীক্ষায় সেকেন্ড ডিভিশন পেলাম। ইন্টারেও তাই। আমার প্রতি তার পুরোপুরি মোহভঙ্গ হয় যখন দুই বারেও বিএ পাস করতে পারলাম না। দ্বিতীয়বার বিএ ফেল করার পর আব্বা একদিন তার অফিসে নিয়ে গেলেন। তার সুনামের কারনেই কেরানির মত কিছু একটা চাকুরি হল আমার।

এরপরেই বাবা অসুস্থ হয়ে বিছানায় পড়ে গেলেন এবং মারা গেলেন প্রায় বিনা চিকিৎসায় । শেষ মুহূর্তে তার ব্যাথা কমানোর জন্য একটা ইনজেকশন কেনার টাকাও ছিল না আমার কাছে । আমি বাবার হাত ধরে বসেছিলাম, বাবা চোখ বড় বড় করে বলছিলেন, বড় কষ্ট হয় ব্যাটা বড় বড় কষ্ট হয়। আমার কিছুই করার ছিল না।

বাবার মৃত্যুর পর আমার বিয়ে হয় । বীথি নামের এক ছিপছিপে শ্যামলা তরুণী আসে আমার ঘর আলো করে । বাসর রাতে তাকে দেখে বুকের ভিতরে কেমন একটা হাহাকার করে উঠেছিল । প্রতিজ্ঞা করেছিলাম আমার যা হয় হবে তবুও এই মেয়েকে কোনওদিন কষ্ট দিব না । খুব বেশি কিছু করার ক্ষমতা আমার ছিল না। তবুও তার মাঝেই আমি আমার সবটা দিয়ে চেষ্টা করতাম তাকে সুখে রাখার। তবু মনে হতো হয়তো সে খুশী নয়। আমি ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞাসা করতাম তুমি সুখি তো?? সে কিছু বলত না । মাথা নিচু করে হাসত । সেই হাসির মানে আমি বুঝতাম না । যেমন বুঝতাম না কেনও সে মাঝরাতে বিছানায় বসে থাকতো চুপচাপ। কেনইবা একা একা বারান্দায় বসে নিঃশব্দে মুছত চোখের কোণ । এও বুঝিনি কেনও সে আমাকে কিছু না বলেই চলে গেলো চিরতরে। অন্যান্য দিনের মতই ছিল সেই দিনটা । বীথিকে কখন দেখবো এই অস্থিরতা নিয়ে বাড়িতে ঢুকেছিলাম । তারপরেই আবিস্কার করলাম সব শূন্য পড়ে আছে। বীথি নেই। কেউই নেই। কোথায় গেলো কেনও

গেলো কিছুই বলে যায়নি । খুব কষ্ট হয়েছিলো সেদিন । হয়তো সেদিনের মত কখনই নয় । সারারাত বারান্দায় বসে শিশুর মত কেঁদেছিলাম আমি । কিছুদিন খোঁজ করার পর একদিন সেটাও ছেড়ে দিলাম। যে হারিয়ে যেতে চায় তাকে কি আর খুঁজে পাওয়া যায় !

কয়েকদিন পর আমার চাকুরি চলে যায়। ক্যাশ থেকে পাঁচ হাজার টাকা সরিয়েছিলাম আমি। বিথির জন্য এক জোড়া সোনার চুড়ি কিনব বলে । চাকুরি চলে গেলেও সোনার চুড়ি আমার কাছে থেকে গেলো । যে জিনিস কখনও সে ব্যাবহার করতে পারল না সেটাই রেখে দিলাম তার একমাত্র স্মৃতিচিহ্ন হিসবে। আজ এত বছর পরেও সেই চুড়ি বের করি আর দীর্ঘশ্বাস ফেলি । হায় কি অদ্ভুত মানব জীবন!

চাকুরি চলে যাওয়ার পর অনেকবারই আত্মহত্যা করার চিন্তা করেছি। যে জীবনের কোনও অর্থই নেই সেই জীবন রেখে কি লাভ এই ভেবে। কিন্তু আমার মত মানুষেরা এক জীবনে কিছুই ঠিকঠাক করতে পারেনা। সে চাইলেই কোনও জোছনা রাতে চিরতরে ঘর ছেড়ে বের হয়ে যেতে পারেনা। ইচ্ছে করলেই পারেনা কোনও চলন্ত ট্রাকের নিচে মাথা দিতে। আর পারেনা বলেই একদিন আবার জীবন চালাতে শুরু করে জীবনের নিয়মে। বেঁচে থাকার জন্য বেঁচে থাকে এক দীর্ঘকাল । আমিও তাই বেঁচে আছি জীবনের নিয়মে। এই ঘাট সেই ঘাট ঘুরে থিতু হয়েছি এক ওষুধের দোকানে । খারাপ কাটে না সময়। সকালে পেপার পড়ে রাজা উজির মারি । সারাদিনের কেনাবেচা শেষে দোকানের মেঝেতেই বিছানা পেড়ে শুয়ে পড়ি । আমার সাথে থাকে আরজু মিয়া। ১০ বছর বয়সী কিশোর । বীথি থাকলে হয়তো ওর বয়সী একটা ছেলে থাকতো আমার । এই কারনেই ওকে বড় আপন লাগে। আমি কথা বলতে পছন্দ করি । আরজু মিয়া আমার কথার একমাত্র শ্রোতা । আমার জীবনে খুব বেশি গল্প নেই। তাই মাঝে মাঝে বানিয়ে গল্প বলি। দোকানের মালিক বিরক্ত হয়। আমি পাত্তা দেইনা। আরজু মিয়ার মুগ্ধ চোখ আমার ভালো লাগে।

আর আমার জীবনে বেশি গল্প নেই সত্যি কিন্তু বলার মত গল্প নেই সেটা সত্যি না। সবার জীবনেই একটা ব্যাক্তিগত গল্প থাকে। এমনকি যার পৃথিবীতে কিছুই নেই সেও একটা গল্প পুষে রাখে বুকের গহীনে । আমি আমার সেইরকম একটা গল্পই শোনাবো আপনাদের ।

২

তখন আমি গার্মেন্টসে চাকুরি করি। একা মানুষ তাই অনেক রাত পর্যন্ত কাজ করি। মেসে ফিরতে ফিরতে গভীর রাত হয়ে যায়। সেদিনও এমন গভীর রাতে মেসে ফিরছিলাম আমি । সম্ভবত বর্ষাকাল । আকাশ ভেঙ্গে বৃষ্টি নেমেছে। আমি বৃষ্টিতে ভিজছি আর ক্লান্ত পা টেনে নিয়ে আসছি। মেসের

কাছাকাছি একটা অন্ধকার গলিতে ঢুকতেই একটা মেয়ে হাত খামচে ধরল আমার । ফিসফিস করে বলল, আমাকে বাঁচান । আমি চমকে গেছি। এই গলিটার নানারকম বদনাম আছে। ছিনতাই তো খুব স্বাভাবিক ঘটনা । বুঝতে পারলাম আজ আমি তেমন কিছুরই মুখোমুখি হতে যাচ্ছি । আমি কিছু বলছিনা দেখে মেয়েটা আবারও ভয়ার্ত কণ্ঠে বলে উঠলো, আপনার পায়ে পরি আমাকে বাঁচান । এই সময় হঠাৎ বিদ্যুৎ চমকাল। আমি প্রথমবারের মত মেয়েটাকে দেখালাম। কি অপূর্ব সুন্দর মুখ! আমার অস্তিত্ব জুড়ে হাহাকার করে উঠলো! বহুকাল আগে এমনই এক মুখ দেখে এইভাবেই হাহাকার করে উঠেছিল বুকের ভেতর । আমি জিজ্ঞাসা করলাম কি হয়েছে? মেয়েটা বলল, "২ টা লোক আমাকে ধরতে আসছে। আমাকে বাঁচান" । আমি কি করব বুঝে উঠতে পারলাম না। হঠাৎ কি মনে হল পাশের একটা পুরানো পাঁচিল দেখিয়ে বললাম, এর আড়ালে লুকান । মেয়েটা দৌড়ে গিয়ে লুকিয়ে পড়ল। আর ঠিক সেই সময়ই গলির ওই প্রান্তে উদয় হল ২ জন লোক। এক জনের হাতে লম্বা ছুরি, অন্ধকারেও চকচক করছে। তারা আমার সামনে এসে দাঁড়ালো । আমার কলার চেপে ধরে পেটে ছুরি ঠেকিয়ে বলল, মেয়েটা কই?? তুমুল বৃষ্টিতেও আমার গলা শুকিয়ে গেলো। মনে হল আমার হৃদপিণ্ডের শব্দ বোধহয় এই লোক দুটোও শুনতে পাচ্ছে। কিন্তু আমি মাথা ঝাকিয়ে ভয় সরিয়ে দিলাম। সম্পূর্ণ উল্টো একটা রাস্তা দেখিয়ে বললাম ওই দিকে গেছে মেয়েটা। লোক দুটো আমাকে ছেড়ে সেদিকে দৌড় দিল। আমি চুপচাপ সেখানেই দাঁড়িয়ে থাকলাম। থরথর করে কাঁপছে আমার পুরো শরীর । কিছুক্ষণ পর আড়াল থেকে বেরিয়ে এলো মেয়েটি । কিন্তু কিছু বলল না। হঠাৎ আমার একটা হাত ধরল সে। আশ্চর্য আমার গলা আবার শুকিয়ে গেলো কেনও!

৩

আমাকে নিশ্চয়ই এখন আর ব্যর্থ মানুষ মনে হচ্ছে না?? মনে হচ্ছে প্রচণ্ড দুর্বল মানুষটাও একদিন করে ফেলতে পারে কোনও অসম্ভব কাজ?? আসলে প্রতিটা মানুষই নিজেকে নায়ক ভাবতে ভালবাসে । সব ক্ষেত্রে হেরে গেছে যে সেও তার নিজের জগতে একজন বীরপুরুষ । আমিও তাই করেছি । সত্যি কথাটা হলো সেদিন যখন লোক দুটো আমার পেটে চাকু ধরল আমি সেদিন ভয়ের সরূপ দেখেছিলাম। এতদিন মূল্যহীন মনে হওয়া জীবনটাও হঠাৎ আমার কাছে ভীষণ দামি হয়ে যায়। তাই আমি অবলীলায় আঙ্গুল উঁচিয়ে দেখিয়ে দিয়েছিলাম মেয়েটা ঐখানে লুকিয়ে আছে! এরপর লোকদুটো মেয়েটাকে টেনে বের করল । মেয়েটা তাদের একটুও বাধা দিল না । এমনকি যে লোকটা তার কাপড় ছিঁড়ছিল সে তার দিকেও তাকিয়ে ছিল না। সে তাকিয়ে ছিল আমার দিকে। বিদ্যুতের আলোয় দেখা সে দৃষ্টিতে কোনও রাগ ছিল না। ছিলনা অভিমান, কোনও ঘৃণা। তার দৃষ্টি জুড়ে শুধু অনিঃশেষ শূন্যতা । এমনই সে শূন্যতা, শরীর ভেদ করে এসে দুমড়ে মুচড়ে দেয় বুকের পাঁজর । আমি মাথা নিচু করে আর একবার নিজের ব্যার্থতা মেনে নিলাম ।

পরিশিষ্ট

দুঃখিত পাঠক, ব্যর্থ মানুষের জীবনে কোনও সুন্দর গল্প থাকে না । স্রষ্টা তাদের প্রতি এতটা দয়া দেখান না । তারপরেও একটা অসাধারন গল্পের অপেক্ষায় কেটে যায় তাদের সারাটা জীবন!

একটি বন্দী দীর্ঘশ্বাসের আত্মকথন

সেদিনও এমন কুয়াশামাখা শরতের ভোর ছিল। আমাদের বাড়ির সামনে শিউলি গাছটার নীচে রোজকার মতই ফুল কুড়াচ্ছিল কয়েকজন মেয়ে। খেয়াল করলাম তাদের মাঝে একজন নতুন মেয়ে। হঠাৎ নতুন মেয়েটা আমার দিকে তাকিয়ে মুখ ভেংচে দিল। ভীষণ অবাক হলাম। রাগ হলাম তার চেয়েও বেশি। ছোট ছোট পা ফেলে তোর কাছে যেয়ে বললাম, অ্যাই মেয়ে আমাকে ভেংচি কাটছিস কেন? তুই ও খেপে গিয়ে বললি, তুই আমাদের দিকে তাকিয়ে আছিস কেন? তখন কতইবা বয়স হবে তোর, ৫ কিংবা ৬। অথচ কি তেজ! আমার বয়সটাও তোর সমান ছিল বলেই এত বড় অপমান সইল না। শুরু করে দিলাম মারামারি। কত দিন আগের কথা। অথচ সেদিন এর মনে হয়।

তোর সাথে মারামারি করে সম্পর্কটা শুরু হয়েছে বলেই হয়তো ভাব জমতেও বেশি সময় লাগেনি। আর ছেলে বেলার রাগ তো আজ করলে কালই আর মনে থাকেনা। তাই আমিও অচিরেই তোদের ফুল তোলার সাথি হয়ে গেলাম। আস্তে আস্তে তোর খেলার সাথি। কত দুপুর মা'র চোখ ফাকি দিয়ে তোদের বাসায় চলে যেতাম। তোদের বাড়ির বাগানের পিছে চলত আমাদের বনভোজন। ঘাসের তরকারী ইটের মাংস আর মাটির ভাতেই তখন অমৃত। কোনও কোনও দিন তোর পুতুলের বিয়ে হত। আমি হতাম বেয়াই তুই বেয়াইন। সেই বিয়ে নিয়ে ঝগড়ার অভিনয় করতে করতে শুরু হয়ে যেত সত্যিকারের ঝগড়া। আঙ্গুল কেটে আড়ি দিয়ে প্রতিজ্ঞা করতাম এই শেষ। আর কখনও তোর সাথে খেলব না। কিন্তু দুপুর পেরিয়ে বিকেল নামতেই তোর জন্য মনটা কেমন করতো। অসহায়ের মত তোর বাড়ির আশেপাশে ঘুরতাম। তারপর একসময় তুই আমাকে ডেকে আবার আঙ্গুল কেটে ভাব করতি। কি ভালটাই না লাগত তখন। আরেকটু বড় হলাম। স্কুলে ভর্তি হলাম। পুতুল খেলা ছেড়ে আমি তখন ফুটবল খেলি। কিন্তু দিনে একবার তোর সাথে খেলা চাই ই চাই। কোনোদিন কোনোদিন দেখা না করলে কি ঝগড়াটাই না করতি। তোর রাগ ভাঙ্গাতে পাড়ার ফুলের গাছগুলো নিঃস্ব হত। কতদিন কত বাগান থেকে তোর জন্য ফল চুরি করেছি। তুই জানতে চাইলে অবলীলায় বলে দিতাম,বাসা থেকে এনেছি!

তারপর আমরা আরেকটু বড় হলাম। তখন কৈশোরকাল। নিজের ভিতর অনেক পরিবর্তন হয়ে গেছে বুঝতে পারি। তোর সামনে যেতে লজ্জা করে। তোর একটু স্পর্শ পেলেই সারা রাত সেই স্মৃতি ফিরে ফিরে আসে। তোকে দেখার জন্য মনের ভেতরে এক অন্যরকম অস্থিরতা। কিন্তু তুই সামনে এলেই কি এক চাপা কষ্ট ভোর করতো বুকের ভেতর। তোর ও কি এমন হত? কখনও বলিসনি আমাকে। তবে তোর পরিবর্তন আমিও টের পেতাম। সেই আগের মত ঝগড়া করতিস না। অল্পতেই অভিমানি হতিস। আমাকে কি এক শাসনে আগলে রাখতে চাইতি সবসময়। আমার উপর যেন তোর কত জন্মের অধিকার। আর আমিও আমার সব অবাধ্যতা নিয়ে গুটিয়ে যেতাম তোর ছায়াতলে। কত দিন ভেবেছি তোকে সব বলে দিব,কিন্তু সাহস হয়নি কোনোদিন।

এবং ততদিনে আমাদের উপর চোখ পরে গেছে সবার। আমাদের দেখা সাক্ষাত আর নিতান্তই নির্দোষ নেই সবার কাছে। নানা কানাঘুষো শুনতে পাই চারিদিকে। তাই আমাদের কথা বলা কমে গেছে। আমদের যোগাযোগ হয়ে গেছে আরও কম।

তাই অন্যের কাছে শুনি রাস্তায় বখাটেরা তোকে যন্ত্রণা দেয়। শুনি বাসা থেকে তোর বের হয়ে যাওয়াই বন্ধ হয়ে গেছে। বন্ধ হয়ে গেছে স্কুল যাওয়া। আরও শুনি কাকা কাকি নাকি তোকেই বকেন। তারপর একদিন শুনলাম তোকে মামা বাড়িতে পাঠিয়ে দেয়া হয়েছে। তারওপর শুনলাম তোর বিয়ে ঠিক হয়ে গেছে। অনেক চেষ্টা করলাম তোর খোঁজ পাওয়ার। কিন্তু সবাই মুখে কুলুপ এঁটেছে। ভাসাভাসা ভাবে শুনলাম ওখানেও বখাটেরা তোর খোঁজ পেয়ে গেছে। তারপর একদিন আসলো সেই ভয়াবহ দিন। খবর আসলো তুই আত্মহত্যা করেছিস! তুই কিছু না জানিয়েই আমার সমস্ত না বলা কথার উর্ধে উঠে গেছিস!

বিশ্বাস কর আমার কষ্ট হয়নি। প্রচণ্ড রাগ হয়েছিল তোর উপর। তাই তোর লাশটা যখন নিয়ে আসলো আমি একবার দেখতে যাইনি। তোকে কোথায় কবর দিল তাও আমি খোঁজ নেইনি। সবাই খুব অবাক হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু তখনও আমার রাগ। কেন তুই আমাকে একটিবার ডাকলি না? কেন তুই আমাকে কিছু না বলেই একা একা এত দূর পথ পাড়ি দিলি?

কিন্তু পাথরও হয়ত একদিন গলে যায়। অনেক অনেক নির্ঘুম রাতের পর আমিও একদিন কাঁদলাম। আমিও সব কষ্টগুলোকে স্বীকার করে নিলাম নিজের কাছে। তারপর তোর দেয়া প্রথম এবং শেষ চিরকুটটা বের করলাম, তোর মামাতো বোন দিয়েছিল তোর মৃত্যুর পর। একটা আধ ময়লা কগজে ছোট করে লিখা " কোন জন্মের পাপের নীচে পিষ্ট হলাম দুজন জানিনা,কিন্তু জেনে রাখিস আগামি জন্মে যদি তুই সমুদ্র হস তবে তোর বুকে বৃষ্টি হয়ে ঝরব আমি"। সেই থেকে আমি পুনরজন্ম এর অপেক্ষা করি.....

তারপর সময় কেটে যায়...একে একে পাড়ি দেই অনেকগুল বছর। এখন আমি ভোরে ঘুমাতে যাই। পুতুল খেলার বদলে এখন আমার চোখে নেশার ঘোর। কোনও মেয়ের স্পর্শ আমাকে এখন আর লজ্জিত করেনা। কার সাথে ঝগড়া করে আড়িও দেয়া হয়না আর। এখন আমি যা বলার সরাসরিই বলতে পারি। অনেক সম্পর্কের আদর শাসনে জড়ানো আমি। অনেক নিত্ত নতুন স্বপ্নের নীচে চাপা পরে যায় শৈশবের হারানো ইচ্ছেগুলো। চরম স্বার্থপরতার মাঝে বহুদিন আগে হারিয়ে যাওয়া এক

অভিমানি কিশোরীর জায়গা কোথায়? তাই আমার আর পুনর্জন্ম হয়না। হয়তো হবেও না আর কখনও।

লোকে বলে সময় সব কিছু ভুলিয়ে দেয়। সমস্ত ক্ষত শুকিয়ে দেয় পরম যত্নে। তারপরও জানতে ইচ্ছে করে... যদি তাই হয়... তাহলে কেউ কি বলতে পারে এখনও ঝুম বৃষ্টির সময় সমুদ্র আমাকে এত তীব্রভাবে ডাকে কেন? কেউ কি বলতে পারে এখনও কোনও শিউলি গাছ দেখলে কেন বুক চিরে বেরিয়ে আসে বন্দী দীর্ঘশ্বাস???

কুড়ি বছর পরের একদিন

তোমাকে,

রাজশাহী স্টেশনে নেমেই খানিকটা চমকে গেলাম। বহু বছর আগে দেখা সেই স্টেশনের কিছুই আর অবশিষ্ট নেই। সেই ছোট্ট প্লাটফর্মের জায়গা নিয়েছে এক বিশাল প্লাটফর্ম। ছোট্ট দরজা দিয়ে বের হওয়া নয় এখন হাটতে হয় অনেকটা পথ। চাপাচাপি করে দাঁড়িয়ে থাকা মানুষের ভিড়ও এখন অনেকটা কম । অনেক মানুষই বসে আছে বিশাল সব পিলারের নীচে করা গোল করা জায়গায়। সেখানেই বসে আছে এক মেয়ে। হয়ত নতুন বিয়ে হয়েছে। ঘোমটার আড়ালে প্রায় পুরো মুখটাই ঢাকা। কিন্তু বসার ভঙ্গি অবিকল বহু বছর আগে এই স্টেশনে বসে থাকা আরেক সদ্য বিবাহিত মেয়ের মত। মুহূর্তের জন্য আমি থমকালাম। শিমু, তোমাকে মনে পড়ল ।

আমি ওখানেই একটা সিগারেট ধরালাম। কেনও জানিনা এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকলাম। এক ধরনের কৌতূহলে। মেয়েটা কি তোমার মত দেখতে?? খানিক পরেই ঘোমটা একটু সরে যাওয়ায় তাকে দেখালাম । অপূর্ব সুন্দর এক মুখ! কিন্তু তোমার মত নয়। যত সুন্দরই হোক তোমার মত " ক্ষমাহীন গাঢ় রূপসীর মুখ" সে কোথায় পাবে।

আমি বেরিয়ে এলাম। কত দিন পর এলাম সেই প্রিয় শহরে । কিছুই চিনতে পারিনা। পারার তো কথাও না। কতই না বদলে গেছে একদিন হাতের তালুর মত চেনা শহরটা । সেইসব কোনোমতে হেঁটে যাওয়ার রাস্তাগুলো এখন একেকটা রাজপথ। প্রাচীনগন্ধী বাড়ির দখল নিয়েছে আধুনিক সব দেওয়াল । আমাদের সেই বাড়িটাও খুঁজতে গিয়েছিলাম। সেই যে দুই কামড়ার ভাড়ার বাসাটা যেখানে একদিন শুরু হয়েছিলো তোমার আমার পুতুল খেলার সংসার। তোমার মনে আছে প্রথম দিন বাসায় নিয়ে গিয়ে কি লজ্জাটায় না পেয়েছিলাম! টিনের ছাদের প্রায় ভাঙ্গা বাসায় ঢোকা মাত্র কি প্রবল বৃষ্টি। একটা সময় পানি ঢুকে গেলো ঘরের ভিতর। ঘর গোছানো বাদ দিয়ে তুমি লেগে গেলে পানি সেচতে। আমার পক্ষে সে দৃশ্য দেখা সম্ভব ছিল না। নিজের অক্ষমতায় নিজেই ছোট হয়ে যাচ্ছিলাম । বাহিরে এসে সিগারেট ধরিয়ে নিজের লজ্জা ঢাকার ব্যর্থ চেষ্টা করছিলাম প্রাণপণে। এক সময় তুমি পাশে এসে দাঁড়ালে । আমি হড়বড় করে বললাম, পরের মাসেই নতুন বাসা নিবো যত কষ্টই হোক। তুমি হাসলে । বললে, আপনি যেখানে থাকবেন আমিও সেখানে থাকতে পারবো। বলেই লজ্জা পেয়ে মাথা নিচু করে ফেললে। সেদিন রাতেই আবার তীব্র ঝড় বৃষ্টি। মনে হচ্ছিল টিনের চাল উড়িয়ে নিয়ে যাবে।

একটা সময় ভয় পেয়ে তুমি আমাকে জড়িয়ে ধরলে। সেই প্রথম আমি পূর্ণতা পেলাম। এরপর কত বড় বাড়িতেই না আমরা থেকেছি । কিন্তু সেই ভাঙ্গা চালের নীচে কাটানো রাতটার মত অপূর্ব কোনও রাত কি আর এসেছে আমাদের জীবনে??

না অনেক খুঁজেও সেই বাড়িটা পেলাম না। পেলাম না আরও অনেক কিছুই। সেই সবুজাভ পুকুর বিলের শহর এখন অনেক বেশি যান্ত্রিক । সেই যান্ত্রিকতার ভিতর আমি যেন প্রাগৈতিহাসিক মানুষ যে খুঁজে ফিরছে তার স্মৃতির ভাগশেষ । অথচ এখানে আমি কাজেই এসেছিলাম। আসলে বয়স হয়েছে তো। এই বয়সেই স্যাঁতস্যাঁতে মনে মানুষ প্রবল আবেগে ছুঁতে চায় তার অতীত । আমিও বুড়ো হয়ে যাচ্ছি শিমু। সোডিয়াম আলো যখন কুয়াশার মত ঝরে আমি পথে পথে হাঁটি আর মনে মনে আবৃত্তি করি "আমরা হেঁটেছি যারা নির্জন খড়ের মাঠে পউষ- সন্ধ্যায়" ।

হাঁটতে হাঁটতে একসময় পদ্মায় পৌঁছে গেলাম। পদ্মা পাড়ও আগের মত নেই। ইট কাঠ পাথরে সাজানো হয়েছে ঘাট। সন্ধ্যা হলেই আলোকসজ্জায় আলোকিত হয়ে ওঠে নদীর ধার। সেই আলোর লোভে হাজার হাজার মানুষের ভিড় হয়। সেখানে তোমার আমার প্রিয় নির্জনতা খুঁজে পাওয়া ভার। তবুও আমার চোখ খুঁজে ফেরে টি বাঁধের উপর সেই কাঁটাতার বিছানো জায়াগাটা, যেখানে রাত্রি গভীর হলে তোমার কণ্ঠে বেজে উঠত বিষাদের কোনও সুর। একটা সময় আমার কাঁধে মাথা রাখতে তুমি। তোমার চোখের জলে ভিজে যেত আমার শার্ট । আমি ফিসফিস করে বলতাম,
আমার মনে অনেক জন্ম ধরে ছিল ব্যাথা
বুঝে তুমি এই জন্মে হয়েছো পদ্মপাতা।
তখন কি আমার কাঁধে আশ্রয় খুঁজে পাওনি তুমি?? সেই বুক উদাস ঠাণ্ডা বাতাস, ঢেউয়ের নির্জন শব্দ, সারা রাত ঝরে পরা নক্ষত্রের আলো কি সুখী করেনি তোমায়?? জানা হয়নি আমার। আজকাল মনে হয় কি জানো, মানুষের আসলে সুখী হওয়ার প্রয়োজন নেই। যে এইটুকু স্মৃতির কারনে সারাজীবন কষ্টকে বুকে ধারণ করতে হয় তবে কেনও এত সুখী হতে চাওয়া??

হয়তো এসব দার্শনিক ভাবনা তোমার কাছে এখন নিতান্তই অর্থহীন । তুমি নিশ্চয়ই অনেক ভালো আছো। মিজান সাহেব অবশ্যই তোমাকে সুখে রেখেছেন। আসলে মিজান সাহেবের মত মানুষেরা

কাউকে অসুখী করতে পারে না। অবাক হলে?? ভাবছো কিভাবে জানলাম?? তার সাথে একদিন আমার দেখা হয়েছিলো। আমি এড়িয়ে যেতে চেয়েছিলাম। কিন্তু তিনি আমাকে জোর করে এক চা এর দোকানে বসালেন। আমি জিজ্ঞেস করলাম, এত খাতির কি আপনার স্ত্রীর সাবেক স্বামী হিসেবে?? উনি হেসে বললেন, না...শিমু বলেছে আপনি তার দেখা সবচেয়ে ভালো মানুষ। আমি একজন ভালো মানুষের সাথে কিছুক্ষণ কাটাতে চাচ্ছি। আমি হাসলাম । তার কথা যতই শুনছিলাম ততই মুগ্ধ হচ্ছিলাম। সেই মুগ্ধতা আমাকে খুশি করেনি। আমার কেবলই রাগ হচ্ছিল লোকটার উপর। মনে মনে চিৎকার করে বলছিলাম, তুই মর তুই মর!

তুমি ভুল বলেছিলে। আমি ভালো মানুষ নই। ভালো মানুষ নই বলেই তোমার সুখ আমাকে সুখী করেনি। আমি সেদিন রাগে হিংসায় জ্বলে ছাই হয়ে গিয়েছিলাম। আমি ছাড়া অন্য কেউ তোমাকে সুখী করবে এটা আমি কিভাবে সহ্য করি! তারপর একদিন অনেকগুলো ঘুমের ওষুধ খেয়ে শুয়ে পড়লাম মরে যাবো বলে। কিন্তু তা আর হলো না। আসগর চাচা বাঁচিয়ে দিলেন আমাকে । হ্যাঁ সেই আসগর চাচা, তোমার আরেকজন প্রিয় মানুষ। আমাকে ভালোবেসে যিনি আমার সাথেই কাটিয়ে দিলেন সারাটা জীবন। হাসপাতালে জ্ঞান ফেরার পর তিনি আমার হাত ধরে কাঁদছিলেন । আমি মুখ ফিরিয়ে নিলাম । যেভাবে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছি সবসময় সব ভালবাসার মানুষদের কাছে থেকে। এতকিছু পেয়েও কাউকে দিতে পারলাম না কিছুই। আসলে কিছু মানুষই থাকে এইরকম। কাঁচের মানুষ। তারা অন্যর ছায়া নিজের মাঝে ধারণ করে কিন্তু নিজের ছায়া দেখতে পায়না কোনোদিন।

তোমার মাঝে আমি আমার ছায়া খুঁজেছিলাম। সেইসব পাগলপারা দিন রাতে। তোমাকে ছাড়া একটা দিনও কাটানো কত কঠিন ছিল। তুমি কোথাও একা বেড়াতে গেলে একদিন পরেই কোনও অজুহাত বের করে হাজির হয়ে যেতাম আমি। আমার অজুহাত শুনে মুখ টিপে হাসতে তুমি। আমি লজ্জা পেয়ে যেতাম। কোনও কোনও মাঝরাতে আমাকে ঘুম থেকে তুলে অদ্ভুত সব আবদার করতে। আমি যতই রাগ করতাম ততই তুমি হাসতে। কখনও খোলা আকাশের নীচে আমার হাত ধরে হাঁটতে হাঁটতে আবৃত্তি করতে,

তুমি তো জানো না কিছু, না জানিলে-
আমার সকল গান তবুও তোমারে লক্ষ্য করে!

তখন তীব্র আবেগে তোমাকে চাইতাম। তোমাকে চাওয়ার তীব্রতা এতোটা ছিলই বলে কি তোমাকে হারিয়েছি এত সহজে??

অথচ এমনতো হওয়ার কথা ছিল না। যেদিন তুমি আমাকে তোমার অসুখের কথা প্রথম বলেছিলে আমি থমকে গিয়েছিলাম। আমি জানতাম, তুমি খুবই দরিদ্র পরিবারের মেয়ে। পাওনা টাকা শোধ করতে না পেরে তোমার বাবা আত্মহত্যা করেছিলেন। তোমার মা অনেক কষ্টে তোমাকে লেখাপড়া শিখিয়েছিলেন। সবই জানতাম কিন্তু জানতাম না এই দারিদ্রতা তোমাকে এক অদ্ভুত মানসিক অসুস্থতা উপহার দিয়েছে। যা চেয়েছো তা কখনও পাওনি বলে কারও কিছু পছন্দ হয়ে গেলে সেটা চুরি করার এক অপমানজনক মানসিক ব্যাধিতে আক্রান্ত তুমি। প্রথম যেদিন এসব বললে আমাকে আমি তোমার কান্না জড়ানো মুখটা বুকে নিয়ে বলেছিলাম, তোমার সব অপমান ভুলিয়ে দেব আমি। পরেরদিন তোমাকে এক মনোচিকিৎসক এর কাছে নিয়ে গেলাম । তোমার সাথে দীর্ঘ আলাপের পর তিনি আমাকে আড়ালে নিয়ে বলেছিলেন, আপনার ভালোবাসায় পারবে তাকে সুস্থ করে তুলতে।

শিমু, তোমাকে ভালোবেসেছিলাম। তাই রফিক এসে যেদিন বলল, ভাবী আমাদের বাসা থেকে একটা শো পিস চুরি করে এনেছে আমি বিশ্বাস করিনি। বের করে দিয়েছিলাম ওকে বাসা থেকে। আমি ভেবেছিলাম তুমি এত দিনে সুস্থ। কিন্তু রফিককে বের করে দেওয়ার পর যখন তুমি এসে বললে, তুমি সত্যিই নিয়ে এসেছো আমার মাথায় আকাশ ভেঙ্গে পড়ল। আমি কঠিন সুরে বললাম, তোমার চুরি করা জিনিস তোমাকেই ফেরত দিয়ে আসতে হবে। তোমার মুখ বিবর্ণ হয়ে গেলো। তুমি বারবার বললে এত বড় লজ্জা যেন আমি তোমাকে না দেই। কিন্তু প্রচণ্ড রাগ আর অসম্ভব কষ্টে আমি তখন পাথর হয়ে গেছি। একসময় তুমি নিজেই ফিরিয়ে দিয়ে আসলে । ঘরে ঢুকে দাঁড়ালে আমার সামনে। সিগারেটের ধোঁয়ায় অন্ধকার হয়ে গেছে ঘর। আমার হঠাৎ কি হল জানিনা। তোমার কান্নাভেজা ফোলা চোখ আমার চোখে পড়ল না। সব শক্তিতে তোমার গালে চড় বসিয়ে দিলাম। তোমার সেই অপমানিত নীলচে মুখ আমি কোনোদিন ভুলিনি।

ভুলিনি বলেই তোমাকে ছাড়া দিনরাত অসহ্যবোধ হলো। তোমাকে ফেরাতে গেলাম তোমার মা'র বাড়ি। সব অপরাধ নিয়ে সমর্পিত হলাম তোমার কাছে। কিন্তু তুমি আমাকে ফিরিয়ে দিলে। আহ কতটা কষ্ট জমা হয়েছিলো তোমার বুকের ভিতর। তোমার ফিরিয়ে দেওয়ার দুঃখ নয় তোমার কষ্ট

দেখে আমি আরও নিঃস্ব হয়ে গেলাম। যতটা যোগ্য নই তার অনেক বেশি ভালবেসেছিলে আমাকে। তাই সেই বরফ জমাট অভিমান ভাঙ্গা গেলো না কিছুতেই। অথচ এখন পেছন ফিরে তাকালে সবকিছুই কেমন তুচ্ছ মনে হয়। এই এতটুকু জীবন আমাদের । তাতেও কেনও আমরা জমিয়ে রাখি অসংখ্য বর্ষাকাল, তীব্রও অভিমানের কাঁটাতারে । তোমারও কি তাই মনে হয় না?? মনে হয়না, যে ঝড়ের রাতে শুরু হয়েছিলো আমাদের জীবন, ঠিক সেখান থেকেই শুরু করা যেতো আরেকবার?? জানি এইসব প্রশ্ন এখন অর্থহীন । তোমাকে দোষ দেইনা। কারণ, যৌবনের ভুলগুলো বড় কঠিনতম ভুল। কারণ, যৌবনের আবেগ বড় শুদ্ধতম আবেগ !

তারপরেও জীবনের অসংখ্য যদি, কিন্তু এর মাঝে তুমিও বেঁচে থাকো চিরটাকাল। ভাবতে কেমন অদ্ভুত লাগে এত ভালোবাসাবাসির পরেও আর কোনোদিন পাবো না তোমাকে। আর কোনোদিন দেখা হবেনা তোমার মুখ খানি। তবুও ফিরে চাইবো না তোমাকে। একদিন যাকে সব কিছু দিয়েও ধরে রাখতে পারিনি তাকে আবার চাইবো কোন অধিকারে। তাই আবার হঠাৎ তোমার কোনও স্মৃতির মুখোমুখি হয়ে গেলে লিখব এমনই কোনও দীর্ঘ চিঠি। অনেক না পোস্ট করা চিঠির মত সেই চিঠিও কখনও পৌঁছাবে না তোমার ঠিকানায়। তোমার প্রিয় কবির মত আমিও যে জেনে গেছি “জীবনের গল্প শুধু একবার আসে- শুধু একবার নীল কুয়াশায়” । কিইবা আসে যায় যদি সে গল্প অসমাপ্তই থেকে যায় ।

শেষপর্যন্ত জীবন মানেই তো অসমাপ্ত গল্পের সমাপ্তির অপেক্ষা। মানুষ অপেক্ষা করতে পছন্দ করে না তবু তার জীবন কাটে অপেক্ষায়, অপেক্ষায়.....

(গল্পে ব্যবহার করা সকল কবিতা জীবনানন্দ দাশের)

ক্ষুধা অথবা পরাজয়ের গল্প

১

গলির মুখে একটা ছেলেকে দেখেই রিকশা নিয়ে দৌড়ে এলো আব্দুল করিম । কিন্তু ছেলেটা তার দিকে তাকিয়েই মুখ ঘুরিয়ে নিলো। একটু দূরে দাঁড়িয়ে থাকা আরেক রিকশায় উঠে চলে গেলো ছেলেটি। সে রিকশাওয়ালা আব্দুল করিমের দিকে তাকিয়ে একটু বাঁকা হাসি দিল। আব্দুল করিম কিছু বলল না। এটা তার অভ্যাস হয়ে গেছে। সে কাউকে দোষও দেয়না। তার ৬৩ বছর পুরানো হাড় জিরজিরে শরীর আর চোখে ভাঙ্গা চশমা দেখে কেইবা তার রিকশাই চড়বে! সে তার ক্লান্ত দেহটা নিয়ে রিকশার পাটাতনে বসে পরে। কপালের ঘাম মুছতে মুছতে ভাবতে থাকে সকাল থেকে কতজন এইভাবে চলে গেলো। আসলে প্রতিদিনই এমন হয়। বুড়ো মানুষের রিকশায় চড়ে সময় নষ্ট করবে কেনও লোকে !তবুও আশা নিয়ে থাকতে হয়। কিন্তু শরীর তো আর চলছে না। বাড়ি ফিরে যেতে পারলে ভালো হত। সে ট্যাঁক খুলে টাকা বের করে গুনতে থাকে। নাহ এখনও চালের দামই উঠেনি। মনটা দমে যায়। সারাদিন রিকশা চালিয়ে ১ কেজি চালের দামও ওঠেনি, আরও ৭ টাকা লাগবে, কেমন যেন একটা খারাপ লাগা ভোর করে আব্দুল করিমের ভিতর । কিন্তু এইভাবে আর কতকখ। খুদায় পেটের ভেতর একটা মোচড় দিয়ে ওঠে তবু আব্দুল করিম বসেই থাকে, ঠিক করে আরেকটা ভাড়া মারতে পারলেই বাড়ি ফিরবে।

২

কোথাও না কোথাও স্রষ্টা বলে হয়তো সত্যিই কেউ থাকেন। আর থাকেন বলেই হয়তো কখনও কখনও আব্দুল করিমের মতো মানুষের চাওয়াও পূরণ হয়। খানিক পরেই এক মাঝবয়সী ভদ্র মহিলা তার মেয়েকে নিয়ে আব্দুল করিমের রিকশাতে উঠলেন। হয়তো তাদের খুব তাড়া। ভদ্রমহিলা রিকশাতে উঠেই বললেন, চাচা খুব তাড়াতাড়ি চলেন। আব্দুল করিম অবশ্যই তাড়াতাড়ি যাবে। তাকে যেতেই হবে। কারন তার যেখানে ৭ টাকা দরকার ছিল সেখানে সে ২০ টাকা পাচ্ছে। সে তার সবটুকু শক্তি এক করে প্যাডেলে চাপ দিল। এবং মনে মনে ঠিক করলো আজ বাড়তি টাকা দিয়ে খানিকটা ডাল কিনবে। কতদিন খিচুড়ি খাওয়া হয়না। রাবেয়া, তার বউ, এর খিচুরির সুনাম ছিল সবখানে । একবার কেউ খেলে আরেকবার খেতেই হত তাকে। হঠাৎ পুরানো দিনের কথা মনে পরে যায় আব্দুল করিমের। তিন ছেলে, এক মেয়ে নিয়ে সংসার ছিল তার। সে চাকরি করতো পাটমিলে। কত বৃষ্টির রাতে চার ছেলে মেয়ে নিয়ে খিচুড়ি খেয়েছে তারা। খাওয়া শেষে এক খিলি পান। আহ! কি সুখের দিন ছিল সেসময়! তারপর ছেলে মেয়ে বড় হয়ে আলাদা সংসার শুরু করলো, পাটমিল বন্ধ হয়ে চাকুরি চলে গেলো। শুরু হল জীবনের সাথে যুদ্ধ। আপন ছেলেমেয়েরাও আজ বহুদুর। আব্দুল করিমের বুক চিরে দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে আসে।

“চাচা আরেকটু জোরে চালান না”, ভদ্রমহিলার কথায় বাস্তবে ফিরে আসে আব্দুল করিম। সে কিছুটা বিরক্ত হয়। তার মনে হয় রিকশা তো পঙ্খিরাজের মতো চলছে। আবার সে গায়ের সব শক্তি দিয়ে টান দেয় রিকশা। ভাবে, খিচুড়ি রাঁধতে হবে শুনলে রাবেয়া কত খুশি হবে! তার হাসিমুখের কথা ভাবতেই আরেকটু জোর চলে আসে গায়ে। আবার শুরু হয় প্যাডেলের সাথে যুদ্ধ। কিন্তু কতক্ষণ?? খানিক পরেই ৬৩ বছরের অভুক্ত শরীরটা বিদ্রোহ করে বসে। হাঁপাতে থাকে আব্দুল করিম, রিকশার গতি কমে আসে আরও। রাস্তা মনে হয় কখনও ফুরাবার নয়।

হঠাৎ পিছের যাত্রী বলে ওঠে, দাঁড়ান চাচা দাঁড়ান। আব্দুল করিম বিভ্রান্ত হন। এখনও তো গন্তব্য অনেক দূর। পরের মুহুতে একটা ব্যাটারির গাড়ি রিকশার পাশে এসে দাড়ায়। এইবার বুঝতে পারে আব্দুল করিম। তার খুব রাগ হয়। ভদ্রমহিলা রিকশা থেকে নেমে জিজ্ঞাসা করে, কত দিবো?
আব্দুল করিম বলে, ২০ টিকা।
মহিলা রেগে গিয়ে বলেন, এতোটুকু রাস্তা ২০ টাকা!!!???
- আপনে ২০ টিকা ভাড়া করি উটিছেন, ২০ টিকাই দেওন লাগব।
মহিলা বিরক্তমুখে ৫ টাকা বের করে বললেন, ৫ টাকা নিলে নেন নাহলে বিদায় হন। বলেই গাড়িতে উঠতে লাগলেন। আব্দুল করিমের মনে পরে তার আরও ২ টাকা দরকার। সে বলে ওঠে, আপা আর ২ টিকা দেন। মহিলা তখন গাড়ির ভিতরে। আব্দুল করিমের খিচুড়ি, রাবেয়ার হাসি সব ততক্ষণে উধাও। তার চোখে এক মুথ সাদা ভাত ভেসে ওঠে। সে আর্তনাদ করে ওঠে, আপা আর ২ টিকা.....

ততক্ষণে গাড়ি ছেড়ে দিয়েছে। হঠাৎ করে ভদ্রমহিলা হাত বাড়িয়ে একটা ২ টাকার কয়েন চুড়ে মারলেন। কয়েনটা এসে পড়লো আব্দুল করিমের পায়ের কাছে । তীব্র অপমানে ভেজা হয়ে উঠল তার চোখের কোনা। ইচ্ছে হল টাকাটা ওখানেই ফেলে যায়। কিন্তু সেটা ঐ এক মুহূর্তেরই ইচ্ছা। পরের মুহূর্তে সব ভুলে তিনি হাত বাড়ালেন টাকাটার দিকে।

পেটের ক্ষুধা যে পরাজয়ের অপমান বোঝেনা.....

থেকো অপেক্ষমান অজস্র অশ্রু জলাধারের ওপাশে

১

ভালোবাসা ছিলো আকাশের গায়ে কিছু মেঘেদের নাম...

যদিও আজ মঙ্গলবার তবুও যূথী আজ শ্রাবণকে চিঠি দেবে না । প্রতি মঙ্গলবার যূথী শ্রাবণকে চিঠি লিখে ওর বালিশের নীচে রাখে । শ্রাবণ অফিস থেকে এসেই সোজা বালিশের নীচে হাত ঢুকিয়ে দেয় চিঠির খোঁজে । শ্রাবনের অবশ্য এমন নির্দিস্ট কোনও জায়গা নেই । ও ঘরে আসার কিছুক্ষণ পর থেকেই যূথীকে খুঁজতে শুরু করতে হয় কোথায় চিঠিটা ওর রেখেছে । কোনোদিন প্যান্টের পকেটে পাওয়া যায়, কোনোদিন হয়তো রুমালের ফাঁকে । যূথী কতবার এটা নিয়ে বকেছে ওকে , রাগ করেছে, বলেছে, এরপরে আর খুঁজবেই না চিঠি । শ্রাবণ মুচকি মুচকি হাসবে, বলবে আর করবে না , কিন্তু পরের সপ্তাহে আবার তাই করবে । যূথী প্রতিবারই ঠিক করে এই শেষ, আর খোঁজাখুঁজি করার মধ্যে নেই ও । কিন্তু কোথাও কোথাও ওর ভালোও লাগে, চিঠি পড়ার আগে চিঠি খুঁজে বের করার রোমাঞ্চ ওকে ভালোই টানে । তাই শেষমেশ আবার খোঁজাখুঁজিতে লেগে যায় । ও অবশ্য শ্রাবণের মতো চিঠি পেয়েই হুড়মুড় করে করে পড়ে ফেলে না । রেখে দেয় । বারবার লুকিয়ে লুকিয়ে দেখে । গন্ধ নেয় । এতোদিন হয়ে গেছে, এতোবার চিঠি বিনিময় হয়ে গেছে অথচ এখনও প্রথমবার চিঠি পেয়ে যেমন দুরুদুরু করেছিলো বুকের ভিতরে তেমন করেই বুক দুরুদুরু করে । অবশ্য প্রথমবার অমন বুক কাঁপার যথেষ্ট কারণ ছিলো । শ্রাবণ আর যূথীর বিয়েটা ঠিক হয়েছিলো পারিবারিকভাবেই । প্রথমদিন শ্রাবণকে দেখে যূথীর মনে হয়েছিলো, এই লোকের বিয়ে করার ইচ্ছে নেই । তাকে জোর করে ধরে বেঁধে নিয়ে আসা হয়েছে। কথাটা মিথ্যে ছিলো না । শ্রাবণের ইচ্ছে ছিলো না মেয়ে দেখতে আসার । এরপরের ঘটনা শ্রাবণের ভাষায়, তোমাকে দেখার পরই মাথাটা গোলমাল হয়ে গেলো । যূথী অবশ্য বলে, মোটেও না । তুমি আমার দিকে ঠিক করে তাকাওওনি । বারবার চোখ ফিরিয়ে নিচ্ছিলে, মনে হচ্ছিলো একটা সাপ দেখছো । শ্রাবণ এই শুনে আপ্রান বোঝাবার চেষ্টা করে, না ও আসলে মুগ্ধই হয়েছিলো । যূথীও তাই জানে, কারও মুগ্ধ চোখের দৃষ্টি ওর না চেনার কথা না । কিন্তু সেটা সে শ্রাবণকে জানতে দেয়না । সব কথা ছেলেদের জানতে নেই । দেখে যাওয়ার রাতেই যূথীকে ফোন দিয়েছিলো শ্রাবণ, পারিবারিকভাবে জানানোর আগেই শ্রাবণ বলেছিলো তার মুগ্ধতার কথা । সারারাত সে কথা বলছিলো একাই । কি সব হাবিজাবি । তারপর যখন ভোর হলো, বোকার মতো শ্রাবণ বলে, আরে আজ এতো তাড়াতাড়ি ভোর হয়ে গেলো । শুনে যূথী হাসি আটকে রাখতে পারেনি । বোধহয়

সেই মুহুর্তটাতেই প্রেমে পড়া । এরপরে তাদের ঘনিষ্ঠতা হতে সময় লাগেনি । কিন্তু তাদের মতো করে তাদের পরিবারে ঘনিষ্ঠতা হলো না । দূরত্ব বাড়তে বাড়তে এক পর্যায়ে দুই পরিবারই বেঁকে বসলো , বিয়ে ভেঙ্গে গেলো সব কিছু ঠিক হয়ে যাওয়ার পরেও । যূথী খুব কষ্ট পেলেও নিজে থেকে কিছু বলা তার পক্ষে সম্ভব ছিলো না । কিন্তু শ্রাবণ হাল ছেড়ে দেওয়ার পাত্র না । সে নানাভাবে চেষ্টা করতে লাগলো, কিন্তু বিয়ের সময়ে কেনও জানি সবার ইগোই বড় হয়ে ওঠে । যে মানুষটার কথার দাম পরিবারে কেউই কোনোদিন দেয় নেই এমনকি তার কথাও হয়ে ওঠে মহা গুরুত্বপূর্ণ । শ্রাবণের একার পক্ষে এতোদিক সামাল দেওয়া সম্ভব ছিল না, তাই দুই পরিবারকেও আর এক করা হয়নি তার । যখন যূথী তার ভাগ্যকে মেনেই নিয়েছে প্রায় এমন সময় একদিন চিঠি আসলো শ্রাবণের । প্রচণ্ড ভয় আর আর নার্ভাস লাগছিলো যূথীর , কি লিখা আছে চিঠিতে । তারপর অনেক সাহস যোগাড় করে একসময় যূথী চিঠিটা খুলল , একবার নয় দুইবার নয় পুরো সাতবার পড়লো সে চিঠিটা । তারপরই সে সিদ্ধান্ত নেয়, যা হবার হবে সে শ্রাবণকেই বিয়ে করবে । বাসর রাতে শ্রাবণ জিজ্ঞেস করেছিলো, কেনও তুমি পরিবারের মতামতের বাহিরে গিয়ে আমাকে বিয়ে করার সিদ্ধান্ত নিলে ?? যূথী শ্রাবনের চিঠিটা বের করে ওর হাতে দেয় । শ্রাবণ অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করে, এই চিঠির জন্য ??

- হু । আর এখন এটা তুমি আমাকে পড়ে শোনাবে ।

- পড়ে শোনাবো ??

- হু শোনাবে

শ্রাবণ ওর নিজের লিখা চিঠিটা পড়তে থাকে । ওর বোধহয় খানিক লজ্জাও লাগে । চিঠি শেষ করে ও যূথীর দিকে তাকায় । আবছা অন্ধকারে ও বুঝতে পারে না, যূথীর চোখ অশ্রুতে টলমল করছে ।

বাসর রাতেই ওরা ঠিক করে প্রতি মঙ্গলবার তারা পরস্পরের কাছে চিঠি লিখবে, শ্রাবণ প্রথম চিঠিটা মঙ্গলবার লিখেছিলো তাই । শ্রাবনের কেমন লাগে জানে না কিন্তু যূথীর রোমাঞ্চ এখনও কাটেনি চিঠি নিয়ে । এতদিন হয়ে গেলো অথচ শ্রাবনের চিঠি ওর প্রতিটা শিরা উপশিরায় আনন্দের পরশ বুলিয়ে দেয় । সেটা তাড়িয়ে তাড়িয়ে উপভোগ করার জন্যই ও চিঠিটা পড়ে অনেক রাতে । যখন শ্রাবণ সারাদিনের ক্লান্তিতে গভীর ঘুমে বিভোর । ওর পাশে শুয়ে প্রতিটা শব্দ খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পড়ে যূথী । চিঠিতে, হয়তো নিজের অজান্তেই শ্রাবণ এমন একটা লাইন লিখে ফেলে, যেটা বারবার পড়তে ইচ্ছে করে । পড়তে পড়তে একসময় চোখ ভিজে আসে । সে তখন চিঠিটা রেখে শ্রাবনের বুকে গুটিসুটি

মেরে শুয়ে পড়ে । ঘুমের মধ্যেই শ্রাবণ জড়িয়ে নেয় ওকে । আবার চোখ ভিজে আসতে চায় ওর । কিন্তু ও খুব সাবধান থাকে । ভেজা স্পর্শে ঘুম ভেঙ্গে শ্রাবণ ওর চোখ দেখুক ও চায় না । সবকিছু সবাইকে যে দেখাতে নেই । তবে আজকের খুশিটা খুব দেখাতে ইচ্ছে করছে । কিন্তু যূথী ঠিক করেছে চট করে সেটা দেখানো যাবে না । যাবে না বলে যূথী খুব আয়োজন করছে রাগিয়ে শ্রাবণকে রাগিয়ে দেওয়ার । পরিকল্পনার প্রথম ধাপ হিসেবে চিঠি লিখবে না বলে ঠিক করেছে । এমন একটা ভাব করবে যেনও মনেই নেই । শ্রাবণ নিশ্চয়ই হতভম্ব হয়ে যাবে, মনে মনে রেগেও যাবে । কিন্তু কিছু বলবে না । তারপর খাবার টেবিলে বসে ওর মুখটা কেমন হবে ভাবতেই হেসে ফেলল যূথী । কাঁকরোল ভাজি আর ঝিংগা পটল দিয়ে রুই মাছ । সায়ানের সবচেয়ে অপছন্দের তরকারি । এরপরে ও আর চুপ থাকতে পারবে না । নিশ্চয়ই হইচই শুরু করবে । তখনই সুযোগ বুঝে একটা খোঁচা দিতে হবে, ব্যাস কেল্লা ফতে । বাবু মশাই রেগে লাল হয়ে যাবে । রাত একটু গভীর হলে বিছানায় আসবে যূথী । শ্রাবণ তখন ঘুমের ভান করে মটকা মেরে পড়ে থাকবে । যূথী জানে খুব রেগে গেলে শ্রাবণ ঘুমায় না, ঘুমের ভাব ধরে পড়ে থাকে । আর তখনই কানের কাছে ফিসফিসিয়ে যূথী বলবে গোপন কথাটি , যার জন্য এতো আয়োজন । এরপরে কি হবে যূথী আর ভাবতে চায়না । যেটাই হোক কল্পনা করে সেটা সে নষ্ট করতে চায় না । যূথী গভীর আগ্রহে অপেক্ষা করে শ্রাবনের অফিস থেকে ফেরার ।

রক্তচোষার আত্মকথন

আমি একজন পেশাদার খুনি, এই কথা বললেই আপনাদের চোখে যে ছবিটা ভেসে উঠবে আমি তেমন নই । পেশাদার খুনি বলতে আপনারা যাদের চেনেন তারা আসলে বই বা সিনেমায় দেখা । কিন্তু বই বা সিনেমায় যারা খুনিদের দেখায় তারা কি কেউ কখনও একজন খুনিকে কাছে থেকে দেখেছে ?? খুনিদের কাছে থেকে দেখে একমাত্র পুলিশেরা। কিন্তু পুলিশেরা তো বই লিখে না । তাই লেখকরা কল্পনার আশ্রয়ে খুনি বানান । সেটাও হয় দুই প্রকার । এক, যারা উপায় না দেখে জীবনে মার খেতে খেতে খুনি অপরাধী হয়ে যায়, যাদের দেখে আপনাদের সহানুভূতি হয় । দুই এক ফোঁটা চোখের পানি পড়াও বিচিত্র না । আর দুই নাম্বার হলো, জাত খুনি যারা কোনও কারণ ছাড়াই খুন করে । এদেরকে আপনারা খুব ঘৃণা করেন । আরেকদল খুনি থাকে যারা দুর্ঘটনার বশে খুন করে বসে যাদের প্রতি আপনাদের দয়াও থাকতে পারে ঘৃণাও থাকতে পারে । সত্যিকথা বলতে কি, আমি এদের মধ্যে

কোনওটাই না । আমি মানুষ খুন করি টাকা আর ক্ষমতার জন্য তা নয় । খুন করে আমি আমার লালসা চিরতার্থ করতে চাই বিষয়টা আসলে এমনও না । আবার খুন করেই আমি জীবিকা নির্বাহ করি এটাও সত্যি , সত্যি এটাও যে খুন করতে আমার খারাপ লাগে না। খুনিদের সম্পর্কে আপনাদের আরও ভুল ধারণা আছে । লেখকদের হাতের জাদুতে খুনিদের সাথে একজন মেয়ে থাকবে যে খুনির না রক্ষিতা না বান্ধবী হবে । আমার ক্ষেত্রে এমন কেউ নেই । দুই একজনকে ভালবাসতে ইচ্ছে করেছে , সত্যি বলতে কি তাদের হয়তো আমি ভালোওবাসি, কিন্তু তারা এই জগতের বাসিন্দা হবার মতো নয় । তাদেরকে জোর করে টেনে নিয়ে আনারও প্রয়োজনবোধ করিনি । আর জগতের যারা তারা সিনেমার নায়িকাদের মতো এমন কোনও সুন্দরী না যে তাকে নিয়ে আমার ঘুরতে হবে । জৈবিক তাড়না অনেক বেশি হয়ে উঠলে একটা হোটেলে ঠাণ্ডা করে নিয়ে আসাই ভালো সমাধান । আপনাদের হয়তো ধারণা, খুনি মানেই আগে পিছে লোকজন । আসলে তাও না । আমার মতো পেশাদাররা একাই চলতে পছন্দ করে , যত একা থাকা যায় ততই নিশ্চিন্ত । জানেনই তো এই জগতে খুনিরা ধরা পড়ে সবচেয়ে কাছের মানুষটির কারনে । তাই একটা খুন করলাম তারপর সঙ্গী সাথিদের নিয়ে মদের আসর বসালাম সেটিও সত্য না । বরং সেই সময়েই আমাদের সবচেয়ে সতর্ক থাকতে হয় কারণ খুন করার কয়েকদিনের মধ্যেই আমাদের ধরা পড়ার সম্ভবনা সবচেয়ে বেশি থাকে । আর এতো টাকা পয়সায় বা কোথায় যে মদ নারী জুয়ার পিছে উড়াবো । পুলিশ আর লুকিয়ে থাকার পেছনে তো আর কম খরচ হয়না । তবে আমি ভালো খেতে পছন্দ করি । খুন করতে যাওয়ার আগে আমি বাসায় নান্নার বিরিয়ানি এনে রাখি । খুনের আগে যে উত্তেজনা আর রোমাঞ্চ বয়ে বেড়াই সেটা পূরণ করার জন্য আমি বিরিয়ানি খাই । হয়তো বিষয়টা হাস্যকর লাগছে, কারণ একটা খুনি খুন করে এসে নান্নার বিরিয়ানি খাচ্ছে বিষয়টা কল্পনা করা অস্বাভাবিক, কিন্তু একেকজনের ভাবধারা একেকরকম । আপনাদের সাহিত্যিকরা খুন করার অনুভুতি সম্পর্কে কি লেখে?? সিনেমায় দেখা যায়, পেশাদাররা অনুভুতি ছাড়াই একেকটা খুন করে যাচ্ছে । বিষয়টা আসলে তাই । একটা সময় খুন, রক্ত এসবে অভ্যস্ত হয়ে যায় বলে হয়তো প্রথমদিকের মতো রোমাঞ্চিত করে না। এসব নিয়ে কেউ ভাবেও না। আমার কিন্তু এখনও রক্তের গন্ধ নেশার মতো লাগে । প্রথম বুলেটটা ঢোকার পর রক্তে কাপড় ভেজার মাঝে যে কিছুক্ষণের বিরতি থাকে ওই সেকেন্ডের উত্তেজনার তুলনা কোনও কিছুর সাথে হয়না। তবে শিকার তীব্র যন্ত্রণায় খাবি খাচ্ছে এই দৃশ্যটাও আমার দেখতে ভালো লাগে না । আমি মুহূর্তে প্রানবায়ু উড়িয়ে দিয়ে আনন্দ পাই । এই কারনে আমি কখনও পেছন ফিরে তাকাই না।

অবশ্য কোনও খুনিই তাকায় না, বিবেকবোধের ভয়ে । কি আশ্চর্য । পরিহাস হলেও সত্য যে বিবেকবোধ জেগে উঠবে এর চেয়ে বড় ভয় আর কোনও কিছুতে নেই । আচ্ছা, আমি কি আমার চরিত্রটা ঠিকঠাক বোঝাতে পারলাম?? না পারলেও অবশ্য কিছু করার নেই । আমি খুনি। কবি না । নানা রংচং দিয়ে গল্প শুনাতে আমি আসিনি । আমার এতো সময়ও নেই । আমি বলতে এসেছি, খানিক পরে আমি একটা খুন করতে যাচ্ছি । কন্ট্রাক্টটা গতকালই পেয়েছি । এক বড় কোম্পানির থলথলে শরীরের সিইও । এই ধরনের লোকদের আমার সবসময়ই বিরক্ত লাগে । দেখলেই ইচ্ছে করে আরামপ্রিয় থলথলে চর্বিতে কষে একটা লাথি লাগাই । শ্রেণি বিদ্বেষ বলেন আর অন্যকিছু বলেন, খুনটা করতে আমার ভালো লাগবে সন্দেহ নেই । আমি এখন নান্নার বিরিয়ানির অপেক্ষা করছি । বিরিয়ানি আসলেই আমি বেরিয়ে পড়বো ।

থেকো অপেক্ষমান ... অজস্র অশ্রু জলাধারের ওপাশে ...

শ্রাবনের খুবই বিরক্ত লাগছে । সে অফিসে মনে মনে গর্ববোধ করতো তার স্যার কখনই তাকে পার্সোনাল কাজে যন্ত্রণা দেন না । আজ সে গর্ব ধুলোয় মিশে গেছে । অফিস ছুটির এক ঘণ্টা আগে থেকে সে তার স্যারের সাথে ঘুরে বেড়াচ্ছে । এখন ঢুকেছে শপিং মলে । শ্রাবণের মনে হচ্ছে, তার বস পুরো শপিং মলটাই কিনে নিবে । অন্যের কাপড়চোপড় কেনা দেখা কি যে বিরক্তিকর । তার উপরে আজ মঙ্গলবার । চিঠি দিবস । কখন বাসায় যাবে কখন চিঠিটা পড়বে এই ভাবনায় অস্থির হয়ে উঠছে ও । যূথীর শরীরটাও খারাপ । অস্থিরতা কেবল বাড়তে থাকে । স্যার ওর দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, আপনার মনে হয় দেরি হয়ে যাচ্ছে । শ্রাবণ হাসির মতো মুখ করে বলল, না না স্যার ঠিকাছে । আর মনে মনে কষে একটা চড় লাগালো বসের গালে । ব্যাটা উজবুক, আজাইরা ঘুরছিস আর বলিস দেরি করে দিলাম । মানব জাতির সমস্যা হলো, তারা যা চায় তা বেশিরভাগ সময়েই করতে পারে না । তাই যখন বস বললেন, চলুন বের হই তখন শ্রাবণের মনে হলো এমন মধুর কথা সে বহুদিন শোনেনি । বলতে গেলে লাফিয়ে লাফিয়েই বের হয়ে এলো শ্রাবণ । কিন্তু শপিং মলের দরজায় দাঁড়াতেই তার কেমন খারাপ লেগে উঠলো । শ্রাবণ ঠিক বোঝাতে পারবে না অনুভূতিটা , কেমন জানি বুকের ভিতরে ফাঁকা আর মুখের ভিতরে তিতা একটা ব্যাপার, কেনও এমন লাগলো তাও বুঝলো না, কিন্তু কেমন জানি থমকে গেলো সে । পরের মুহূর্তে চোখের সামনে সানগ্লাস পড়া যুবকটাকে কোমরে হাত দিতে দেখেই মাথার ভিতরে কে যেনও বলে উঠলো, বিপদ ! বিপদ !

২

থলথলে চর্বির মাঝবয়সী লোকটাকে চিনতে কষ্ট হলো না । ঠেলেঠুলে বের করে আনলো শরীরটা শপিং মলের দরজা দিয়ে । আমি কোমর থেকে পিস্তলটা বের করেই গুলি করে দিলাম । তারপর সেই রোমাঞ্চকর অপেক্ষা । বুকের মাঝখানটা লাল হয়ে উঠছে ধীরে ধীরে । আমার শরীরে পরম আবেশে পুলকিত হয় । এইবার মৃত্যু নিশ্চিত করতে আরেকবার পিস্তল তুললাম । হঠাৎ পাশের একটা ছেলে চিৎকার দিয়ে উঠলো, "স্যাররররররর" । চমকে গিয়ে আমার লক্ষ্যভ্রষ্ট হলো । পরের গুলিটা চলে গেলো পাশের ছেলেটার গলা ভেদ করে । আসেপাশের লোকজন দৌড়াদৌড়ি শুরু করেছে । চারপাশে ভীত মানুষের হুড়োহুড়ি । আর দেরি করা যায়না । আমি দ্রুত মোটাটার দিকে আরেকটা গুলি করলাম । তারপর লাফিয়ে বাইকে উঠলাম । কেনও যেনও পাশের ছেলেটার কথা মনে হলো । পাশের ছেলেটা কি বেঁচে আছে ?? বেঁচে না থাকলেই আমার সুবিধা, যদিও তাকে গুলি লাগাটা পুরোটাই দুর্ঘটনা, আমার ভুল, তবুও মনে হলো, কেনও যে এইসব আবেগি ছাগলেরা বোকার মতো কাজ করে! এই প্রথমবারের মতো খুন করার পর আমার পেছনে তাকাতে ইচ্ছে হলো । আমি ইচ্ছেটাকে পাত্তা দিলাম না । একজন অপরাধীর যেদিন বিবেকের পুনর্জন্ম হয় সেদিনই তার মৃত্যুদণ্ড লিখা হয়ে যায় । আমি বাইকের গতি বাড়িয়ে দিলাম ।

৩

শ্রাবণ আসছে না কেনও?? যূথীর দুশ্চিন্তা কেবলই বাড়তে থাকে । ও তো কখনই এতো রাত করে না । ফোনও ধরছে না । যূথী বারান্দায় দাঁড়িয়ে টানা অন্ধকারে তাকিয়ে থাকে , যেনও ও তাকিয়ে থাকলেই আঁধার ফুঁড়ে বের হয়ে আসবে শ্রাবণ । যূথী তখনও জানে না আরও কিছুক্ষণের মধ্যে ওর বাড়ি পুলিশ আর সাংবাদিকে ভরে উঠবে । ও জানে না, ওর কান্নাভেজা মুখ উঁচু করে দিবে টিভি চ্যানেলগুলোর বিজ্ঞাপনের দাম । ওর শব্দহীন ছবিটা বাড়িয়ে দিবে দৈনিক কাগজের কাটতি । প্রতিযোগিতা হবে কে কত আবেগমথিতভাবে যূথী আর শ্রাবনের গল্প বলতে পারে । পাঠক, দর্শকের আবেগে টোকা দিতে পারলেই ব্যবসা । প্রতিযোগিতা হবে আশ্বাসের , প্রতিশ্রুতির । সেখানে যোগ দিবে মন্ত্রি সমাজ থেকে শুরু করে সবচেয়ে দূরের আত্মীয় পর্যন্ত । শেষমেশ সব প্রতিশ্রুতিই আবেগ ফুরালেই ভেসে যাবে । পুলিশ ছুটবে নতুন অপরাধের পেছনে, সাংবাদিকরা আবার পাবে কোনও

আবেগে দলিত গল্প, আবার কিছু আশ্বাসের বন্যা ধেয়ে আসবে যেখানে যতদিন স্বার্থ টিকে থাকবে । এমন নিত্য ছুটে চলা অফুরান গল্পের ভিড়ে কেউ যূথীকে খুঁজবে না । জানবে না মঙ্গলবারগুলো কিভাবে কাটে যূথীর । কেউ জানবে না খুব রাতে একা লাগলে গুটিসুটি মেরে না ঘুমানোর হাহাকার । বছর ঘুরলে কেউ ফলোআপ করবে হয়তো । করলেও একই ব্যাপার, না করলেও তাই । যে দীর্ঘ লড়াই যূথীকে করতে হবে , সেটা তার একার নিঃসঙ্গ যুদ্ধ । তার জয় পরাজয়ের খোঁজ আমরা রাখবো না, আমাদের রাখার প্রয়োজনও নেই । কিন্তু এসবের কিছুই জানে না যূথী । সে জোর করে সব আজেবাজে ভাবনা দূরে সরিয়ে রাখতে চায় । ভাববে না ভাববে না করেও সে কল্পনা করে, কি করবে শ্রাবন যখন যূথী তার কানের কাছে ফিসফিসিয়ে বলবে, এই যে বাবু সাহেব, আপনি যে নিজেই একটা বাবুর আব্বু হচ্ছেন তা কি জানেন ?? জানেন কি কেউ আপনার ভালবাসায় ভাগ বসাতে আসছে ?? হুমমম??

৪

জীবনের গল্পগুলো কল্পনার মতো সুন্দর হয়না কেনও কে জানে !

দাঁড়কাক সময়ে এক সবুজ প্রজাপতির গল্প

১

বাসায় ঢোকার কিছুক্ষণের মধ্যেই শুনতে পেলাম আব্বা আমার নিতু আপুদের বাসায় যাওয়া নিষিদ্ধ করেছেন ।

২

সব ছেলেদের জীবনেই সম্ভবত একজন আপু থাকেন । কেউ একজন থাকেন যাকে দেখে একটা দীর্ঘ সময় অবুঝ অনুভূতিতে জড়িয়ে থাকে সে । আমার সেই আপুটি ছিলেন নিতু আপু । তখন খুব বেশি বয়স ছিলো না আমার । রোদ এলেই শিশির শুকিয়ে যাবে জেনেও বুকের গহীনে তাকে লুকানোর ঘাসের আপ্রান চেষ্টা দেখে ব্যাথা পেতে শিখেছি আমি। খুব বিকেলে যখন শেষবারের মতো আবীর মেখে নেয় নির্জন গোধূলি তখন অপার্থিব হাহাকারে চোখ ভেজাতে শুরু করেছি আমার । হঠাৎ ঠোঁটের নীচে জেগে ওঠা গোঁফের সরু রেখা আর ভেঙ্গে যাওয়া কণ্ঠস্বর লুকাতে গুটিয়ে নিচ্ছি শামুকের মতো । আমার প্রিয়তম কৈশোর সুতো কেটে উড়ে যাওয়া ঘুড়ির মতো উদ্দাম হওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছে খুব গোপনে । আমার তখন উটভট এক কল্পরাজ্য ছিলো , ছিলো কাঁটায় কাঁটায় ক্ষত বিক্ষত হওয়ার স্বাধীনতা আর নিতু আপু । আচ্ছা, নিতু আপুকে আমি নিতু আপুই বলবো নাকি আমার কল্পরাজ্যের যে ডাকনাম ছিলো সেই নাম ?? না থাক, সেই নাম থাক । বরং সুত্র দেই, আপু ছিলেন আমার কাছে এক তীব্র দীঘি । যে দীঘিতে আমার সাঁতরাবার অধিকার নেই বলে মাছরাংগার মতো উড়ে বেড়াই তাকে ঘিরে । আপু কি বুঝতে পারতেন?? আমি জানি না । আপু ছিলেন ছোট বেলার সেই পাজলের মতো যার সবকটা ঘর কখনই একসাথে মিলে না । অথচ কি দুর্বোধ্য আকর্ষণ ছিলো তার প্রতি ।যতক্ষণ পাশে থাকতাম কি যে হাহাকার লাগতো । কেবলই মনে হতো কি জানি নেই কি জানি নেই। যখন দূরে থাকতাম তখন তার কাছেই ছুটে যেতে ইচ্ছে করতো সবকিছু রেখে । কেটে ছিঁড়ে একাকার হতে ইচ্ছে করতো , ইচ্ছে করতো ঘড়ির কাঁটার মতো হারিয়ে যাই সময়ের অতলান্তে,ইচ্ছে করতো মরে যাই । নিতু আপু কি সব জানতেন?? তিনি আমাকে ডেকে বলতেন, এই ছেলে আমাকে কেমন লাগেরে তোর?? বিয়ে করবি আমাকে?? আমি লজ্জায় মাথা নিচু করতাম । আপু বলতো, ইশ আমার লাজুক জামাইরে ! তুই কবে বড় হবি বলতো ! মাঝে মাঝে হুট করে পাশে দাঁড় করিয়ে বলতেন, ইশ তুই বড় হতে হতে আমি বুড়ি হয়ে যাবো ! তখন কি আর আমাকে ভালো লাগবেরে তোর । আমি কিচ্ছু বলতাম না, কিছু বলার সাহসই বা কই পাই?? আমার কথা জানতো কেবল আমার বাঁধাই করা নোট খাতা । আমার কথা জানতো লুকিয়ে রাখা কবিতার একেকটি শব্দ । ঘুম না আসা রাতগুলো কেবলই দীর্ঘ হতো , অনুভুতির অংকগুলো জটিল হতো আরও । তবে আমার

জটিলতা যেমন কেউ জানতো না, আপুর জটিলতাও আমি জানতাম না । কোনও কোনও দিন ছাদে ডেকে নিয়ে গিয়ে আপু বলতেন, আমি এখন কাঁদবো তুই আমার পাশে চুপচাপ বসে থাকবি । আমি দেখতাম আপু কাঁদছে । তার চিবুক, তার একেলা ছায়া, কিছু শিরোনামহীন শব্দ আর সারা জীবন পাঁজরে বেঁধে থাকা মুহূর্ত । আমি ভাবতাম, এর সাথে যদি জুড়ে যেতো আমার নিয়তি । ভেবেভেবে ব্যাথা পেতাম। কাঁদা শেষ হলে নিতু আপু বলতো, একটা গান শুনা তো, প্রেমের গান ।আমি গান ধরতাম আর আপু খিলখিল করে হাসতো । বলতো , যদি কোনোদিন প্রেম করিস তাহলে ভুলেও প্রেমিকাকে গান শুনাবি না , সাথে সাথে ভেগে যাবে ।

৩

আমাদের পাড়ায় নিতু আপুর আরও একজন প্রেমিক ছিলো , নয়ন ভাইয়া । গোল গোল চোখ , নিতু আপু ছিলো তারও ধ্যান জ্ঞান । পাড়ার ভালো ছেলেরা সাধারণত তাদের ভালো লাগার কথা মেয়েদের বলতে পারে না । নয়ন ভাই পাড়ার ভালো ছেলে,তিনিও বলতে পারতেন না । তাই শেষমেশ আমাকে বেছে নিলেন ডাকপিওন হিসেবে । খুব রাগ হলো আমার , বুকের ভিতরটা পুড়ে গেলো ভয়ে, যদি নয়ন ভাইকে নিতু আপু পছন্দ করে ফেলে । হলো উল্টো, চিঠি পড়ে তো আপু হেসেই কুটিকুটি , আমিও টাকশাল থেকে বের হওয়া পাঁচ পয়সারমতো ঝকঝকে হয়ে উঠলাম । প্রতিবার নয়ন ভাই এর চিঠি নিয়ে যাই দুরুদুরু বুকে, এইবার বুঝি নিতু আপু তাকে পছন্দ করে ফেললো , প্রতিবার ফিরে আসি সুখী হয়ে । আমারও ইচ্ছে করে নিতু আপুকে কার্নিশে টাঙ্গানো রোদের গল্প বলতে । বলতে ইচ্ছে করে, শেষ বিকেলের নিঃসঙ্গতার কথা । বলা হয়না । শেষমেশ মধ্যরাতের বানানো রুপকথাগুলো মরে যায় ভোরবেলারবৃ থা চাঁদের আবয়বে । এই পৃথিবী বৃষ্টি শেষে ভেজা দাঁড়কাকের ব্যাথা বোঝে কিন্তু এক কিশোরের চোরাবালিতে ডুবে যাওয়ার ব্যাকুলতা বোঝে না ।

৪

বোঝেনি আমার সমবয়সীরাও । তারা ভেবেছিলো নিতু আপুর নগ্ন শরীর আমাকে আনন্দ দিবে । মাত্র দুই মিনিট ত্রিশ সেকেন্ডের ভিডিও ছিলো ওটা । বিছানায় দেবীর মতো পড়ে থাকা নিতু আপু । তাতে উপগত একজন পুরুষ , অচেনা , হয়তো তার আসল প্রেমিক যার কথা জানা হয়নি আমার কোনোদিন । অনুভুতিশূন্য আমি তাকিয়েছিলাম, নিতু আপুর মুক্তো দানার মতো শরীর, পরিতৃপ্ত চোখ মুখ । ওরা আপুর প্রতিটা অংশ নিয়ে মন্তব্য ছুঁড়েছিলো, ওরা আমাকে আনন্দ দিতে চেয়েছিলো । আর ওদের কথাতেই অনুভুতি ফিরে পেলাম আমি , আছাড় দিয়ে ভেঙ্গে ফেললাম মোবাইলটা । ওরা হতভম্ব হয়ে গেছিলো । সৎবিৎ ফিরে পেতেই ইচ্ছেমতো ঝাঁপিয়ে পড়েছিলো আমার উপরে । আমাকে পিটিয়ে রাস্তায় শুইয়ে দেওয়া বা আমাকে “নিতু আপুর ব্যর্থ প্রেমিক” বলে উপহাস কোনওটাই কষ্ট দেয়নি ।

অথচ আমার মনে হচ্ছিলো কেউ একজন আমাকে টেনে টেনে ছিঁড়ছে, আমার আত্মাটাকে নির্মম হাতেছিঁড়ে ছিঁড়ে ছুঁড়ে দিচ্ছে নিঃসীমে । আহ ! এতো কষ্ট ! এতো কষ্ট সহ্য করেও মানুষ বেঁচে থাকে ! কেনও??

৫

-আমার শরীরটা পছন্দ হয়েছে তোর??

আমি মাথা নিচু করে বসে থাকি । শেষ সন্ধ্যার তারার আলো ছড়িয়ে যাচ্ছে আকাশের চওড়া জমিনে । তবুও যেনও অন্ধকার আরও ঘন হয়ে আসে । আমি আপুকে দেখতে পাই না । আপু আবার জিজ্ঞেস করে, তুই আমাকে বিয়ে করবি তো?? নাকি অন্যপুরুষকেশরীর দিয়েছি বলে এখন আমাকে ঘৃণা করবি??

আমি চোখে কান্নার ছায়া পড়ে । আপু অন্ধকারে দেখতে পায় না। নীরবতা অসহ্য লাগে । আপু আবার বলে, জানি পারবি না আর আমাকে ভালোবাসতে । চেনা আছে তোদের । এর চেয়ে নয়ন ঢের ভালো । নয়ন কি বলেছে জানিস??

আমি তাকাই আপুর দিকে । “ নয়ন বলেছে, সে আমাকে নিয়ে বহুদূর চলে যাবে । যেখানে আমার কলঙ্কের ছায়া থাকবেনা । আমাকে কেউ চিনবেনা । আবার নতুন করে শুরু করবো আমরা” । এই প্রথম নয়ন ভাইকে হিংসা হলোনা আমার । এই প্রথম নয়ন ভাইকে আমার একটুও হিংসে হলো না । মনে হলো, এটাই হওয়া উচিৎ ।মনে হলো, আপু তুমি চলে যাও যতদূর তোমার স্মৃতিও তোমার কাছে পৌঁছাবে না । নিতু আপু হাহাহাহাহা করে হাসতে থাকে । বলে, যার আর কিছুই দেওয়ার নেই সে কি নিয়ে হারিয়ে যাবে বলতে পারিস । আপুর হাসি থামে না । আমি রাস্তায় নেমে আসি । এরপরে বহুদিন কেটে গেছে। মানুষের নিষ্ঠুরতা বারবার নিঃস্ব করেছে আমাকে, বারবার মিশিয়ে দিয়েছে ধুলোয়, অনুভবকরিয়েছে আমার অসহায়তা । কিন্তু সেদিন যে অনিঃশেষ অনুভবশূন্যতা অনুভব করেছিলাম তা হয়তো সমস্ত জীবনে মানুষ একবারই অনুভব করে । একসময় বাসায় ফিরলাম । কিছুক্ষণ পর জানলাম আব্বা আমার নিতু আপুর বাসায় যাওয়ায় নিষেধাজ্ঞা জারি করেছেন ।

৬

আব্বা কোনোদিনও জানতে পারেননি নিতু আপু যে ঘুমের ওষুধগুলো খেয়ে আত্মহত্যা করেন সেসব আমিইযোগাড় করে দিয়েছিলাম ।

নিকষ অন্ধকার

আর কিছুক্ষণ পর আমি বীথিকে খুন করবো। বীথিকে চিরতরে মুছে ফেলব আমার জীবন থেকে। অদ্ভুত ব্যাপার হল কোনও অনুশোচনাবোধ বা কোনও অপরাধবোধ কাজ করছে না আমার ভিতর। বরং এক ধরনের স্বস্তি খেলা করছে। আমি দরজার ফাঁক দিয়ে বীথির দিকে তাকালাম। রান্নাঘরে চা করছে আমার জন্য। শান্ত নিরব মুখ। আচ্ছা কতদিন হল ওর সাথে আমার বিয়ে হয়েছে?? উমমম ৪ বছর। এই কয় বছরে আমাদের কি কখনও ঝগড়া হয়েছে?? মনে পড়ছে না। হঠাৎ করে আমার বিয়ের প্রথম দিনের কথা মনে পড়ে গেল। সারারাত ও আমার সাথে একটা কোথাও বলেনি। পরে বলেছিল তাঁর নাকি আমাকে প্রচণ্ড ভয় লেগেছিল। খুব অবাক হয়েছিলাম।

খুব অদ্ভুতভাবে আমাদের সম্পর্ক শুরু হলেও আমি ওকে পছন্দ করেছিলাম। বোধ করি বীথিও। অল্প অল্প করে সমস্ত সংসারটা সাজিয়েছিল ও। আর দশটা বাঙালি মেয়ের মতই স্বামী সংসার অন্তঃপ্রান। তবে বড় বেশি শান্ত আর অন্তর্মুখী। প্রানচ্ছলতা খুবই কম। শুধু এইটুকু বাদ দিলে আসলে ওর বিষয়ে অভিযোগ করার মতো কিছুই কখনও পাইনি আমি। বরং ভালই লাগত সবকিছু।

তবে মেয়ে হিসেবে বীথি কতটা জৌলুশহীন এটা বুঝেছিলাম আমার জীবনে সিনথিয়া আসার পর। সিনথিয়া আমার অফিসের সহকর্মী। সদাচঞ্চল, অস্থির, পাগলাটে। সারাক্ষণ কিছু না কিছু দুষ্টু বুদ্ধি ঘুরছেই তাঁর মাথায়। মাত্র কয়েক দিনেই গোটা অফিস তাঁর ফ্যান হয়ে গেল। আমিও তাদের মধ্যে একজন। কিন্তু কিছুটা সিনিয়র, কিছুটা স্বভাবগত কারনেই ওর কাছ থেকে দূরে থাকতাম। হয়তো সেটাই সিনথিয়াকে আকর্ষণ করে থাকবে। কিছুদিনের মাঝে সে নিজে থেকেই আমার সাথে সম্পর্ক সহজ করে ফেললো। তারপর সুযোগ পেলেই আড্ডা, এক সাথে লাঞ্চ, চুপিচুপি নানা এডভেনচার। এমনকি আমার মতো গম্ভীর টাইপ মানুষকেও সে এক পার্টিতে নাচিয়ে ছাড়ল।

আমি বুঝতে পারলাম আমি সিনথিয়ার প্রেমে পড়ে গেছি। সাথে এও বুঝলাম বীথির প্রতি আমার বিন্দু মাত্র আকর্ষণ নেই। বীথি হল সেই শান্ত নদী যার সাথে আমি শুধুই বসবাস করতাম এতদিন। আর সিনথিয়া সেই কাল বৈশাখী ঝড় যার স্বপ্ন এতদিন লুকিয়ে ছিল আমার গহীনে। সিনথিয়াতে আমি এতই আচ্ছন্ন ছিলাম বীথি কি করছে না করছে কিছুতেই মন দিতাম না। সারাক্ষণ ওকে সিনথিয়ার সাথে তুলনা করতাম মনে মনে, শেষে মিলাতে না পেরে আরও হতাশ হয়ে যেতাম। বোধহয় বীথিও টের পেয়েছিলো কিন্তু কিছুই বলতো না আমাকে।

শেষে নিজেকে আর সামলাতে না পেরে একদিন সিনথিয়াকে বলে দিলাম আমার অনুভুতির কথা। ও আপত্তি করল না। শুধু শর্ত দিল, বীথিকে ছাড়তে হবে। হঠাৎ করেই বাস্তবতা সামনে আসে দাঁড়ালো আমার। বিশাল দেনমোহর, ভরণপোষণের দায়িত্ব, পারিবারিক ঝামেলা পেরোনো আমার কাছে অসম্ভব মনে হল। কিন্তু ততদিনে আমি বেপরোয়া। সিদ্ধান্ত নিলাম বীথিকে খুন করবো।

যোগাযোগ করলাম আমার সবচেয়ে কাছের বন্ধু আজাদের সাথে। আজাদ শহরের সবচেয়ে নামকরা উকিল। ফাঁসির আসামিকেও নির্দোষ প্রমান করার রেকর্ড আছে ওর। সব খুলে বললাম ওকে। ও প্রথমে মানা করলো। শেষে আমার করুণ হাল দেখে আর নিষেধ করলো না। বরং আশ্বাস দিল, যেহেতু বীথি বিয়ের আগে কিছুদিন মানসিক হাসপাতালে ছিল সেহেতু ওকে পাগল প্রমান করে আমাকে বাঁচানো ওর কোনও ব্যাপারই হবেনা। তারপর আমরা দুইজনে মিলে পরিকল্পনা করলাম...

“কি ভাবছ এতো?” বীথির কথায় সংবিত ফিরল আমার। দেখি চা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে ও। আমি বললাম “কিছু না”। ওর হাত থেকে চা এর কাপটা নিলাম। ও একটু হেসে বেডরুম থেকে বেরিয়ে গেল।

আমি চায়ে চুমুক দিলাম। একটু যেন তিতা। ভাবলাম টেনশনের কারনে এমন লাগছে। মনে মনে পরিকল্পনাটা আরেকবার নেড়েচেড়ে দেখলাম। খুব সহজ প্লান। একটা চাকুতে বীথির ফিঙ্গার প্রিন্ট নিতে হবে, ঘরের জিনিসগুলা এলোমেলো করতে হবে,নিজেকে আহত করতে হবে তারপর ওই চাকু দিয়ে বীথিকে মারতে হবে। এমন একটা ভাব আনতে হবে যেন মানসিকভাবে অসুস্থ একজনের কাছ থেকে আত্মরক্ষা করতে গিয়ে খুন হয়ে গেছে। ভাবতে ভাবতে আমি চায়ে দ্বিতীয় চুমুক দিলাম। এইবার আগের চেয়েও তিতা লাগলো। বুকের ভেতর একটা ঝাঁঝালো অনুভুতি। আমি ভ্রূ কুঁচকে আরেকটা চুমুক দিলাম চায়ে। এইবার যেন সমস্ত গলা জ্বলে গেলো। বুকের পাঁজরগুলো যেন চামড়া ছিঁড়ে বেরিয়ে আসবে। পেটের ভিতর নাড়িভুঁড়ি গলে যাচ্ছে। উফ কি যন্ত্রণা! কি যন্ত্রণা! হাতপা অসাড় হয়ে আসছে। পড়ে গেলাম বিছানার উপর। বুঝলাম বিষ খাওয়ানো হয়েছে আমাকে। সাপের মতো মোচড়াতে শুরু করলো সমস্ত শরীর। উফফ! মনে হল বাঁচতে হলে চেতনা হারানোর আগেই আমাকে আজাদকে খবর দিতে হবে। অমানুষিক পরিশ্রমে হাত বাড়ালাম বিছানার উপর রাখা মোবাইলের দিকে, ঠিক তখনই আমার মোবাইলের পাশে রাখা বীথির মোবাইল বেজে উঠল। ঝাপসা চোখে দেখলাম আজাদের নাম। কিন্তু সেখানে আমার হাত পৌঁছাবার আগেই বীথি ফোন ধরল। ততক্ষণে আমার চোখ বন্ধ হয়ে গেছে। অস্পষ্ট সুরে বীথিকে বলতে শুনলাম, “হাঁ জান কাজ হয়ে গেছে,তুমি চলে আসো”। আমার সমস্ত শরীর থরথর করে কেঁপে উঠল। শেষবারের মতো অস্ফুটে উচ্চারণ করলাম, আজাদদদ । তারপর নিকষ অন্ধকার.....

বাকের ভাইদের জন্য এলিজি

ছোটবেলায় সম্ভবত আমাদের সবার পাড়াতেইএকজন বাকের ভাই থাকতেন ।

ঘরের খেয়ে বনের মহিষ তাড়ানো কথাটা তাদের সাথে খুব যায় । রাস্তার পাশে কোনও দোকানে কয়েকজন সাগরেদ নিয়ে সারাদিন তাদের চা খেতে দেখা যেতো । মাঝে মাঝে গলা ছেড়ে সুরে বেসুরে গেয়ে উঠতেন কোনও হিন্দি কিংবা বাজার চলতি বাংলা গান । তাদের আবশ্যিক নিয়ম ছিল, পাড়ার সবচেয়ে সুন্দরী আপুর প্রেমে পড়ে যাওয়া । কখনও সে আপুকে তাদের ভালো লাগার কথা বলতে পারতেন না, কিন্তু একটা নিয়ম ছিল আর কেউ সেই আপুর দিকে তাকাতে পারবে না । কেউ তো আপুকে ডিস্টার্ব করতোই না বরংআপুটি হতো পাড়ার অঘোষিত ফার্স্ট লেডী । তারপর একদিন হয়তো অন্য কোনও ছেলের সাথে আপুর বিয়ে হতো , আর আমাদের বাকের ভাইরা কিছুদিনের জন্য দেবদাস হয়ে যেতেন । শুধু তাই না,পাড়ার মান সম্মান রক্ষা ও নিরাপত্তার দায়িত্বও নিজ দায়িত্তে ঘাড়ে তুলে নিতেন আমাদের সময়ের বাকের ভাইরা । কোনও কোনও দিন পাড়ার থমথমে অবস্থা দেখলে বুঝতে পারতাম,আজ শান্তিবাগ অথবা টিকা পাড়ার সাথে মারপিট আছে , জায়গা মতো প্রস্তুত থাকতো চাইনিজ,নেপালি ! তবে অন্য পাড়াদের বাকের ভাইদের সাথে যেমনই আচরণ হউক, নিজ পাড়ায় তারা কখনও বেয়াদবি করেছে এমন ইতিহাস নেই । বরং বড়দের সম্মান দেওয়া, যে কারও বিপদে তারা এগিয়ে আসতো সবার আগে। এরপরেও তাদের ব্যাপারে ভয় তো আর খানিকটা থাকতোই । তাই তারা চাঁদা চাইলেই সবাই পকেট থেকে টাকা বের করে দিতো । যদিও টাকাটা খরচ হতো খেলাধূলা আর সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজনে । হয়তো এসব কারনেই , তাদের ভিতরে থাকতো অন্যরকম একটা হিরইজম কিংবা ম্যানারিজম । যে হিরইজম এরপ্রতি গোপন দুর্বলতা ছিলো আমাদের মতো দুর্বল ছেলেদের ।

অবশ্য সেইসব দিন গত হয়েছে বহু আগেই । এখনকার ছেলেদেরমাঝে আর কাউকে বাকের ভাই হওয়ার প্রবণতা দেখি না । আত্মকেন্দ্রিক এই প্রজন্মের পড়াশুনা আর ফেসবুকের পর অলস সময় কোথায় । আর যাদের অলস সময় আছে, তারা হয়ে যাচ্ছে নেশাগ্রস্ত । তাই আজ আর কেউ বড় আপুদের প্রেমে পড়ে দেবদাস হয়না বলে আপুরা শিকার হন ইভ টিজিং এর । এক পাড়ার সাথে আরেক পাড়ার মারামারি হয়না বহুদিন । বিপদে পড়লে বাকের ভাইরা নয় , মোবাইল নামক যন্ত্রটিই ভরসা । কমপিউটার গেমস খেলা ছেলেমেয়েরা বিস্কুট দৌড় কিংবা দড়ি টানাটানি খেলাতে গ্রাফিক্স কিংবা গতির মজা পায়না ।যেমন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে পাওয়া যায়না জি বাংলা কিংবা স্টার প্লাসের মজা । তাই সেসবও বন্ধ ।

আর কেমন আছে সেই পুরানো বাকের ভাইয়েরা ?? একজন শুনেছি চাকরি নিয়ে আরেক জেলায় , ঢাকায় গার্মেন্টস কর্মী আরেকজন । এক ভাই ছোটখাটো ঠিকাদার, একজন ব্যবসা দাড় করানোর চেষ্টা করে যাচ্ছে । আর আমি যাকে দেখে এই লিখাটি শুরু করলাম সে একেক সময় একেক কাজে জীবন চালিয়ে নেওয়ার চেষ্টায় ব্যস্ত । এইবার রাজশাহী এসে দেখি ইফতারির দোকান দিয়েছে কমিশনার অফিসের সামনে । কাল এক ছেলের সাথে দোকানে কি নিয়ে যেনও গণ্ডগোল, আমাদের বাকের ভাই তাকে ধমকাচ্ছেন, তুই চিনিস আমি কে তুই চিনিস আমি কে ?? এই পাড়ার নতুন অধিবাসী সেই ছেলের তার হুমকি ধামকিতে তেমন ভয় পেতেদেখা গেলো না । এক ইফতারি বিক্রেতাকে কেইবা পাত্তা দেয় । তাই খানিক চিল্লাফাল্লার পর আমাদের বাকের ভাই চুপসে গেলেন। তবে বিস্ময়কর ব্যাপার, সেটা দেখে আমার খুবই খারাপ লাগলো । এক সময়ে যাকে খানিকটা হলেও ভয় পেতাম তার এমন পতনে যতটা খুশি লাগার কথা ততটা লাগলো না । কারণটা কি শু ধুই আমার অতীত প্রিয়তা নাকি এক রাজ্য হারানো সম্রাটের আত্মগর্ব রক্ষার শেষ চেষ্টাটি ব্যর্থ হতে দেখার করুনাবোধ ?? জানি না।

ভাবছি, আমাদের পরের প্রজন্ম , যারা একদিন কোথাও কেউ নেই বইটি পড়বে , দেখবে কোথাও কেউ নেই নাটকটিও , জানবে, বাকের ভাই এর মুক্তির জন্য রাস্তায় নেমেছিল হাজার মানুষ , তাদের বিস্মিত চোখ কোনোদিনও কি বুঝবে,এইসব বাউন্ডুলে মানুষগুলোর জন্য কেনও আমরা এতো মমতা পুষে রাখতাম বুকের ভিতরে??

যে কারনে আজ মধ্যরাতে আমার মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হবে

১

রাজ্যের রাজা যদি কাউকে রাজ্যরত্ন বলেন তাহলে সাড়া পরে যাওয়ার কথা তো বটেই । আমার বুকে যখন রাজ্যরত্ন খেতাবের রিবন লাগানো হলো তখন সবাই বলল, এতদিনে একটা সত্যিকারের কাজের লোক পেলো পুরষ্কারখানা । দেশের প্রধান পত্রিকায় লিখা হলো, মানুষের আদিমতম আকাঙ্ক্ষা সুখী হওয়ার আকাঙ্ক্ষা । আমরা যা কিছু করি না কেনও সবকিছুতেই সুখ বিনা অন্যকিছুর চাওয়া থাকে না। কিন্তু শেষপর্যন্ত অসুখিই রয়ে যাই । তাই মানুষকে সুখী করবার যন্ত্রটি সত্যিকার অর্থেই সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ আবিষ্কার ।

আর আমি, মানুষকে সুখী করবার যন্ত্রের আবিস্কারক, সমগ্র মানবজাতিকে গভীর বেদনা থেকে মুক্তি দিতে চেয়েছিলাম ।

২

(পূর্ব কথা - নিশিতা মারা গেলো ঠিক আমবস্যার রাতে । বাদুরের চোখের মতো অন্ধকার সে রাত । নিশিতে পাওয়া পাখিগুলোও ঘুমিয়ে পরেছিলো সে রাতে । আর নিশিতার ধূসর হওয়া শরীরের পাশে ঠাণ্ডা নক্ষত্রর মতো চুপচাপ বসেছিলাম আমি । কোনোদিন এতো শীতলতা জমেনি আমার বুকের ভিতর । খুব ভালবেসেছিলাম আমি ওকে , খুব বেশি । তাই বুঝি সব হারিয়ে শূন্য অনুভূতিতে ঝুলে ছিলাম পলকতলে । কত ভেজা দিন, কত শুকনো পাতায় দীর্ঘ পথ, কখনও অসমাপ্ত উপন্যাসের মতো দীর্ঘ রাত একা একা কেটে গেলো তবুও নিশিতা বুকের গহীনে থেকে গেলো অবিশ্রাম রক্তক্ষরণ হয়ে । ওকে পেয়ে আমি যেমন চিনেছিলাম ঘাসের উপর কোন শিশিরটি ঘুমিয়ে যায় রোদ মেখে । তারপর ওকে হারিয়ে জানলাম কেনও সব পূর্ণতার মাঝেও পাঁজরের ফ্রেমে কিভাবে জমে থাকে দীর্ঘশ্বাস ।

তারপর - অনেক শূন্য হাতের নিথর রাতের শেষে আমি আবার কাজে নামলাম । সব কষ্ট, সব দীর্ঘশ্বাস মুছে ফেলার জন্য । একদিন, সত্যিই এক অভূতপূর্ব যন্ত্র আবিষ্কার করলাম ।)

৩

সমগ্র দেশে হুড়োহুড়ি পরে গেলো । সবারই যন্ত্রখানা চাই । কেউ রাতের পর রাত অপেক্ষায় কাটিয়ে দিলো শুধু একবার তার কষ্টগুলো নিভিয়ে নিতে। কেউ লেগে গেলো মারামারিতে । কেউ চুরি করে হলেও চাই । ধনি গরিব রাজা প্রজা কোনও ভেদাভেদ নেই । সবারই চাই কষ্ট নিধন যন্ত্র , এমনই নাম দিয়েছে ওরা । আমি অবাক তাকিয়ে রই । এতো যন্ত্রণা মানুষের মনে ! এতোটা সুখের সাধ মানুষের শিরা উপশিরায় ! কে জানতো !

৪

মানুষের সুখী হওয়ার প্রয়োজনীয়তা কি?? কেনও এতো সুখী হতে চাওয়া ??

৫

কেউ কি কখনও ভেবেছে কেনও এতো সুখী হতে চায় সে ?? বোধহয় না । তাই গণহারে সুখী মানুষ চলতে শুরু করলো পথের শরীরজুড়ে । সেই পথ চলায় কোনও তাড়া নেই । কোনও চাওয়া নেই । নেই কোনও আকাঙ্ক্ষার তীব্রতা । তীব্র অলসতায় বাড়তে থাকে শরীরের ঘের , বাড়তে থাকে বুদ্ধির স্থূলতা আর নাম না জানা ক্লান্তি । বড় কুৎসিত সে দৃশ্য ।

৬

শহরের বুদ্ধিজীবীরা হায় হায় করে উঠলেন । শ্রম দেওয়ার কেউ নেই বলে থেমে গেছে উদ্যোগ । অন্তরদহন নেই বলে কেঁদে ওঠে না কবির কলম । অপূর্ণতা নেই বলে কারও খোঁজ করে না কেউ । এমন সময় অন্য ক্রোশ দূর থেকে আগমন হলো সুযোগসন্ধানী মানুষের । তখনই হুঁশ হলো রাজার । একঘেয়ে জীবনে ছটফট করে উঠলো কেউ কেউ । তারপর গ্রেফতার হলাম আমি ।

৭

বিচারক রায় বললেন, সুখী মানুষের সমাজ স্থবির সমাজ । সমাজকে এগিয়ে নেওয়ার জন্যই প্রয়োজন ত্রুটিপূর্ণ জীবনের । এই কারনেই প্রকৃতি মানুষকে অসুখী প্রজাতি করেছে । বিচারক জানিয়ে দিলেন আমি প্রকৃতির নিয়মের বিরুদ্ধচারণ করেছি তাই আমাকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হবে , ধংস করা হবে আমার আবিষ্কার । আমার মৃত্যুর কষ্ট থেকে আবার কষ্ট পেতে শুরু করবে মানুষ ।

শেষ কথা

কিছুক্ষণ পর আমাকে ফাঁসি দেওয়া হবে না । আমার কোন অনুভূতি হচ্ছে না । আমি আমার যন্ত্র আমার উপরে ব্যবহার করিনি । কারন আমি মৃত্যুর আগে মৃত্যুর বিষণ্ণতা অনুভব করতে চাই । অনুভব করতে চাই, মৃত্যুর আগের শেষ মহৎ ভাবনাটি । তাই আমি মৃত্যু নয়, এক তীব্র বেদনার অপেক্ষায় আছি ।

যে রাতে আমরা একটা কবিতার দোকান পুড়িয়েছিলাম

১

আমাদের এক বন্ধুর স্বপ্ন ছিলো বড় হয়ে সে একদিন কবিতার দোকানদার হবে ।

২

আমজাদের দোকানে কেবল অন্ধকার ঢুকতে শুরু করেছে তখন ।পশ্চিমের আকাশ তার তাবৎ সৃষ্টিশীলতা নিয়ে ঝুলে পড়েছে আবিরের ক্যানভাসে ! আমাদের দাঁত কেলানো হাসি আর অকালপক্ক আড্ডাটা জমবে জমবে করছে এমন সময় তুহিন দৌড়াতে দৌড়াতে এসে আমাদের চাপাচাপিতে জায়গা দখল নেয়! ওর ঘামের বিন্দু নুইয়ে পরে নিঃশ্বাসের দ্রুততায় । এক গ্যালন চা ঝিমিয়ে পড়া পাকস্থলীতে পাঠিয়ে দিয়েই ও বলে, তাহের একটাকবিতার দোকান দিয়েছে ! আমাদের গল্প খাওয়া সন্ধ্যাটা হঠাৎ থমকে যায় । একটা পিচ্ছিল গরম ছলকে ওঠে হাতের ডগায় । তাহলে শেষপর্যন্ত তাহের সত্যিই একটা কবিতার দোকান দিলো। অথচ ও যখন প্রথম কবিতার দোকানের কথা বলেছিল আমরা তখন বুঝিইনি । তারপর যখন বুঝেছিলাম তখন কিলবিলিয়ে হেসেছিলাম সবকটা দাঁতের ফাঁকে ! আহা তখন আমাদের কি বিচিত্র জীবনই না ছিল ! ইচ্ছে করলেই নিজেকে ঘুড়ী ঘোষণা করে তারা ধরতে যেতাম । কোনওকোনও দিন বারান্দার রেলিং পাহারা দিতাম খাতা কলম হাতে ! সারাটা দিন ঘুম লেপটে থাকতো আমাদের চোখজুড়ে , আর সন্ধ্যা হলেই আমাদের স্বপ্ন সন্ত্রাস চলতো আমাদের বাগরম্বরে, বহুদিন আগে উপহার পাওয়া ডাইরির হলুদ পাতায় । মাত্র চারজন থাকতাম আমরা তার চেয়েও মাত্র একটা রুমে, ইমন আমি তুহিন আর তাহের, চার আমড়া কাঠের সেনাপতি । যে রুমে পথ ভোলা রোদ হঠাৎ কোনোদিন দিন ঢুকে পড়লে আমাদের মনে হতো কেউ বুঝি কোহিনূর এনে লুকিয়ে রেখেছে জানালার কার্নিশে ! তারপরেও আমাদের রাজ্যের একটা নাম ছিলো। শ্যাওলামহল ! এই উদ্বাস্তুর শহরে পরজীবী কয়েকজন তাদের ঘুন খাওয়া রাজ্যের আর কি নামইবা দিতে পারতো । সস্তায় পাওয়া একটা গিটার আর আমাদের কোনোমতে পরিস্কার চাদর নিয়ে তুহিনের চৌকি ছিল রংমহল । তুহিনের গানের গলা বড় চমৎকার ছিল । ইমন ছিল মার্ক্সবাদী, একদিন গ্রামে ফিরে যেয়ে ওদের গ্রামের সব জমির আইল ভেঙ্গে দিবে এই নিয়েই বেঁচে ছিল পুরোটা জাগরণ কাল । আমি দেখতাম আমার দুইহাত ভর্তি টাকার আর পকেটভর্তি মেয়েদের শরীরের গন্ধ । আর তাহের, চল্লিশ ওয়াটের হলদেটে ঝাড়বাতির শেষদিন গুলোর নিচে, বলেছিল, একটা কবিতার দোকান দিবে সে । কি দমফাটানো হাসিই না আমরা হেসেছিলাম । কিন্তু শেষ পর্যন্ত ওই পেরেছে । ইমনটা কবেই মরে গেলো বিপ্লব ডায়রির পাতায় বন্দি রেখে । তুহিন ৯ টা - ৫ টা জীবনের বিভীষিকায় হারিয়ে ফেলেছে গিটারের তার। আমি কাদার মধ্যে মুখ থুবড়ে খুঁজছি লটারির টিকেট, আমার পকেটে শুধুই

পোকামাকড়ের চিৎকার । তাহেরের জন্য আমাদের মন কেমন করে ! একদিন জল নালা হিসেব নিকেশ পেরিয়ে যাই ওর কবিতার দোকানে । কি আশ্চর্য দোকান । নাম রেখেছে, রুপালি কবিতা স্টোর । দোকানের এই প্রান্ত থেকে ওই প্রান্ত মাকড়শার জালের মতো ছড়িয়ে আছে অসংখ্য সুতা , সুতাতে রুপালি কাগজে ঝুলে আছে একেকটা কবিতা । যেনও বদ্ধ ঘরে জোছনার এসে আটকে পড়েছে কবিতা হয়ে । আমরা এক দিগন্ত থেকে আরেক দিগন্ত হেঁটে যাই । হঠাৎ দাঁড়িয়ে যাই কোনও কবিতারসামনে, খোলসের ভিতর থেকে মুক্তো দানার মতো উঁকি দেয় কিছু শব্দের জোড়াতালি,

এই অর্থহীন রোদ জল গল্পের শহরে
মাসের শেষে কুড়িয়ে পাওয়া মৃত প্রজাপতির ভিড়ে
রোদ চশমা জেগে আছে পথের পাহারায়
শূন্যতা নাড়ছে কড়া ভুলের ইশারায়
ঝাপসা আয়নায় কার চেহেরা কিসের গরমিল
না জেনেই উড়াল দিবে পোষা গাঙচিল
তাই সুখের গন্ধ খুজি
কাঁচের দরজায় রোজই
আর বেঁচে থাকা যেনও প্রতিস্রুতি নামের ফাকি।

তাহেরের দিকে তাকাই, বলি কত দাম রে এই কবিতাটার ? ও হেসেবলে, ৩০ টাকা একদাম! আমি কবিতা কিনিনা আরও সামনে এগুতে থাকি । যেনও বিশাল এক অনিকেত প্রান্তে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে আমাকে আর আমি এক পক্ষঘাতগ্রস্তকাল হেঁটে যাচ্ছি কবিতাপথে!

৩

তাহেরের দোকান থেকে ফিরলাম এক রাশ বিষণ্ণতা নিয়ে । আমরা যারা হাতের মুঠোয় লাট্টু ঘুরিয়ে ভাবি এটাই পৃথিবী, তাদের মিথ্যে গর্ব নিয়ে বুকের গোপন গহীনে প্রবল বেদনাবোধ থাকে । তারা জানে তারা কোনওদিন এক বর্ষাকাল কাটাতে পারবে না কোনও ব্যাঙের ছাতায় তবুও বৃষ্টিতে ভেজার গল্পর অপেক্ষা করে বিপুল ব্যাথায়। মাঝে মাঝে যখন সে ব্যাথা প্রবল হয় তখন তারা ঘোরগ্রস্ত হয় , মৃত্যুর মতো নিশ্চিত আকংখায় ডুবে যায় সব মুখোশ ভাবনা । এরই মাঝে আরেকদিন তুহিন খবর আনলো, তাহেরের দোকানটা কি একটা পুরস্কার পেয়ে গেছে । কেমন যেনও বুকের ভিতরে চির চির করে উঠলো ।সব ব্যর্থরাই কি এমন চিনচিনে শোকে তাকিয়ে থাকে নিজের নির্মম স্বপ্নগুলোর দিকে?আমরা আবার গেলাম রুপালি কবিতা স্টোরে । আরেকবার চিনচিনে শোক আভিভুত করলো

আমাদের ।তাহেরের দোকানভর্তি মানুষজন । তাহেরের আমাদের দিকে তাকাবার সময় নেই । সে একটার পর একটা কবিতা ঝুলিয়ে দিচ্ছে রুপালি জোছনার গায়ে, মুহূর্তে বিক্রি হয়ে যাচ্ছে । আবার ঝুলাচ্ছে আবার কাড়াকাড়ি পরে যাচ্ছে । কেউ দাঁড়িয়ে আছে শুধু তাকে দেখবে বলবে । আর শরতের ঝিলের মতো আনাবিল মেয়েরা তার পাশে । তাহেরের বুক পকেটে নিশ্চয়ই তাদের গন্ধ ।ওর আমাদের দিকে আহঙ্কারের হাসি আমাদের অন্তর্গত নাবোধক তীব্র আকারে ছড়িয়ে দেয় শরীরজুড়ে । আমি আর তুহিন পেছন ফিরে আসি । যেনও কতকালের না পাওয়া আমাদের অস্তিত্বজুড়ে । হঠাৎ করে বহু পেছনের পর্দা ছিঁড়ে বেরিয়ে আসে কঙ্কালময় অতীত । সেই যে কবে একটা একটা কালজয়ী গল্প লিখতে চেয়েছিলাম, কিন্তু আজও খুঁজে পাইনি কোনও রঙ্গিন কলম । সেই মেয়েটা কথা দিয়েছিলো, যেখানে শেষ রাতে চাঁদ নেমে যায় আকাশের তলায় ততদুর পাড়ি দিলে সে ফিরে আসবে আবার । কিংবা আমরা যে চার জন একদিন ভেবেছিলাম একদিন আমাদের নামেও আসবে বিখ্যাত হবার আমন্ত্রন, হয়তো ভুল ঠিকানায় তবুও আসবে তো । আজ তাহেরের হাসি আমাদের সব অসমাপ্ত গল্পের পাতা ছিঁড়ে দেয় । আমি আর তুহিন আবার আমাজাদের দোকানে বসি । আমাদের মধ্যে জেগে উঠছে সহস্র বছর পুরানো শয়তানবোধ । তীব্র জিঘাংসায় তছনছ হবে অহংকার!

৪

গোমড়ামুখো রাত পেরিয়ে যাচ্ছে তার যৌবন কাল । অন্ধকার আরেকটু ছায়া সরিয়ে নিচ্ছে আলোর দিক থেকে । বহুদূরে কি ডাকছে ঝিঁঝিঁপোকা ?? কিংবারাত জাগা পাখি?? এই শহরে খুব সম্ভব কোনও রাত জাগা পাখি ডাকে না । এখানে পাখিরাও হয়তো ক্লান্ত হয় স্বার্থপরতার ডানা ঝাপটানোতে । ভালই হয়েছে । কেউ দেখবে না আমাদের,আমি আর তুহিন । আমরা দুইজন যেনও বিম্বিসার আশকের ধুসর জগত থেকে উঠে আসা প্রাচিন অভিশাপ । নাকে বারুদের গন্ধ, পেট্রলের গন্ধ । আমার ভিতরটা কুয়াশার মতো আবছা হয়ে যায় । আমি দেখি আগুন জ্বলে উঠেছে । খুব সূক্ষ্ম কিন্তু সাপের মতো নিখুঁত হিসেবে ছুটছে রুপালি কবিতা ষ্টোরের দিকে । আমরা খুব ভীরুতায় জোরে জোরে হাঁটতে থাকি ।পিছনে লালচে হয়ে উঠছে রুপালি স্টোর। সহস্র বছরের পুরানো প্রতিহিংসা গিলে খাচ্ছে কুসুম কমল জোছনা । বোবা পৃথিবীর বুকে আরেকটি পাপের দাগ একে আমরা গলে যাচ্ছি যেখানে এমনকি চাঁদও আমাদের সাথে আসতে পারে না । আমি শেষবারের মতো পিছনে তাকালাম ।

৫

আমারা তখনও জানিনা আমাদের বন্ধু সে রাতে ঘুমিয়েছিলো তার কবিতার দোকানে !

মৃত নীড়

একটা বাড়ির কি মৃত্যু থাকে ?? সব হারানোর কষ্ট থাকে ??

আমি প্রায় প্রতিদিন আমাদের বাড়ির সামনের লাল বাড়িটার মৃত্যু পথের যাত্রা দেখি । অনেকদিন আগে এই বাড়িটাতে আমি ভয় পেয়েছিলাম । এই বাড়ির যিনি কর্তা, ব্যাবসায় লস খেয়ে আত্মহত্যা করেন, আমি তখন ফোর ফাইভে পড়ি সম্ভবত। আম্মা বলেছিলেন, যারা আত্মহত্যা করেন তাদের আত্মা নাকি পৃথিবীতেই থাকে । আমার কথাটা বিশ্বাস হয়েছিলো বলে তাদের বাসার দেওয়ালের উপরে বেল গাছটা দেখলেই মনে হতো, উনি বুঝি বেল গাছের উপরে বসে থেকে আমাকে দেখছেন । একদিন সাহস করে গভীর রাতে আমি বেল গাছটার কাছে গিয়েছিলেন । আর তখনই একটা বেল ঠাস করে এসে পরেছিল আমার পেছনে । বাতাস কিংবা বাদুরের ডানার কর্ম কিন্তু আমি ভারি ভয় পেয়েছিলাম । তবে বাড়িটা চিরদিন এমন ভূতুড়ে ছিল না । বাড়ির কর্তার অবশ্য আরও দুই বউ ছিল । তাই তিনি খুব একটা আসতেন না । কিন্তু বাড়ির কর্ত্রী অ্যান্টি সারাক্ষণ পাড়া মাথায় তুলে রাখতেন, আঙ্কেল মারা যাওয়ার পর আরও বেশি । বেল গাছের কথা তো আগেই বলেছি , সাথে ছিল পেয়ারা গাছ , সুপারি গাছ , নারিকেল গাছে । আর রাজশাহীর বাড়ি যেহেতু, আম গাছ লিচু গাছ আর কাঁঠাল গাছ তো থাকবেই । সারাক্ষণ পাড়ার দুষ্টু ছেলেরা তার গাছগুলোর পেছনে লেগে থাকতো । তাই অ্যান্টির সাথে তাদের ঝগড়া ছিল চিরদিনের । তার ছিল দুই ছেলে দুই মেয়ে । বড় ছেলেকে কখনও দেখেছি বলে মনে পড়ে না । বড় মেয়েকেও খুব একটা না । কিন্তু ছোট ছেলেকে দেখতাম , প্রায়ই গাছে উঠে বসে থাকতো । আমার সাথে খুব একটা কথা হতো না , কিন্তু আমাকে দেখলেই হাসি দিতো ভাইয়া , দারুন সুদর্শন ছিল , ভারি ভালো লাগতো আমার । ছোট আপুকেও ভালো লাগতো , কি যে কিউট ছিলেন । মাঝে মাঝে আম কাঁঠাল নিয়ে আসতেন আমাদের বাসায় । আমাকে এটা ওটা জিজ্ঞেস করতেন, কথা বলতেন । তখন আমি খুব ছোট আর খুবই মুখচোরা । কখনই তেমন কথা বলতাম না , আপু আম্মাকে বলতেন, ইসসস আপনার ছেলেটা এতো লাজুক হয়েছে কেনও ?? আপুর খুব সুন্দর একটা বাগান ছিলো ছাদে । তাদের বিশাল ছাদে প্রায় শ'খানেক টব , সেখানে কতরকম যে ফুল ফুটতো । সারাবছর । কত দীর্ঘসময় মুগ্ধ হয়ে সে টবের বাগান দেখেছি । তাদের বাসার প্রতি আমার আকর্ষণ ছিল আরেকটা কারনে । তাদের বাসায় প্রায় সময়েই সাউন্ডবক্সে অনেক জোরে গান বাজতো । আমাদের বাসায় তখন রেডিও আর সাদাকালো টিভিতে বিটিভি ছাড়া কিছু নেই । সেখানে তো ব্যান্ডের গান বা হিন্দি গান বাজতো না , আর তারা লেটেস্ট হিট গানগুলো বাজাতেন । বন্ধুদের মুখে শোনা গানগুলো আমার শোনার ওই একটাই উপায় ছিল । আমার মনে আছে, আমাদের বাথরুমে সবচেয়ে পরিষ্কার শোনা যেতো বলে তারা গান ছাড়লেই আমি বাথরুমে গিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতাম, বিশেষ করে রাত দশটার পর মনে আছে !, আইয়ুব বাচ্চুর এখন অনেক রাত গানটা আমি বাথরুমে দাঁড়িয়ে থেকেই মুখস্ত করেছিলাম আমাদের পাড়ার সবচেয়ে আধুনিকমনস্ক বাড়ি ছিল এই !

বাড়িটা, এই বাড়িতেই প্রথম নিউ ইয়ার পিকনিক হতে দেখি আমি । তাদের প্রানচ্ছলতা ভারি ভালো লাগতো আমার । সময় কেটে যায় । বড় ভাই, বোন আগে থেকেই বাহিরে ছিলেন , পরে ছোট দুইজনও চলে গেলো ঢাকায় । বাসায় থাকলেন শুধু অ্যান্টি । আস্তে আস্তে বৃদ্ধ হতে থাকলেন তিনি । তার গলাও পাওয়া যেতো না আগের মতো । আর বাড়িটাও ভরে উঠত শুধু ঈদের সময়েই । আরও সময় যায় । অ্যান্টি অসুস্থ হন , ছেলেরা তাকে নিজেদের কাছে নিয়ে যায় । সেখানে ছেলের বউদের সাথে বনেনি তার , তাই শেষমেশ ছোট আপু তাকে আমেরিকা নিয়ে গেছেন তার নিজের কাছে । এখন আর ঈদেও এই বাড়িতে কারও পদচিহ্ন পরে না ।

শুনেছি বাড়ির দায়িত্ব এক মহিলার হাতে দিয়ে গেছেন তারা । সে মাঝে মাঝে ঘর খুলে ধোয়া মোছা করে । কিন্তু ওই পর্যন্তই । রং প্রায় উঠেই গেছে , কোথাও ভেঙ্গে গেছে সিমেন্ট, কোথাও বড় হয়ে উঠেছে আগাছার দল । ফুলের টবগুলো চুরি হয়ে গেছে সেই কবেই । অনেক গাছ অযত্নে মরে গেছে । আর যেগুলো আছে সেখানে সবার অবাধ যাতায়াত , ইচ্ছে মতো কেউ ডাল ভেঙ্গে নিয়ে যায় কেউ ফল নিয়ে বাজারে বিক্রি করে দেয় । আমরাও একতালা থেকে তিনতালায় উঠে গেছি , এখন আর বেল গাছ দেখে ভয় লাগে না , বরং বেল গাছের পাতার ফাঁক দিয়ে নিঃস্ব বাড়িটাকে দেখি । একদিন এখানেই দুটি মানুষ জীবন শুরু করেছিলেন , কালের অপরিবর্তনীয় নিয়মে কত স্মৃতি উপহার দিয়ে বাড়িটি দাঁড়িয়ে আছে নিঃসঙ্গ , বর্ণহীন । সন্ধ্যাবাতি জ্বালিয়ে দেওয়ারও কেউ নেই । কি করুণ , কি নিষ্ঠুর অপেক্ষা নিয়ে তার দাঁড়িয়ে থাকা , হয়তো মৃত্যুর জন্য , কিংবা আরও নতুন বেড়ে ওঠা দালানের তলায় বিলীন হওয়ার জন্য । আমার ভারি কষ্ট হয়, মায়া লাগে । এতদিন পর আবার বিশ্বাস করতে ইচ্ছে হয় , বাড়ির কর্তার আত্মা সত্যিই রয়ে গেছে বাড়ির কোথাও । বাড়িটার নিঃসঙ্গ সময়ে তারা আছে পাশাপাশি পরম মমতায় ।

থাকুক তারা তাদের মতো । যদি বাড়িরও দুঃখ থাকে, মৃত্যু থাকে তাহলে এমন দীর্ঘ শেষ যাত্রায় কোনও অতৃপ্ত আত্মার পাশে থাকায় এই পৃথিবীর খুব বেশি ক্ষতি বৃদ্ধি তো হবে না !

যে রাতে জোছনার রঙ লাল হয়েছিল

১

আজকের চাঁদটা কি একটু বেশিই বড়?? প্রকৃতি কি আজ রাতে কোনও বিশেষ উদ্দেশে তার সব রূপ নিয়ে নেমে আসছে নিচে??

নাকি অনেকক্ষণ পর চোখ খোলার কারণে সবকিছু অন্যরকম লাগছে আমার?? একটু আগে আমার চোখের বাঁধন খুলে দেয়া হয়েছে। আমি আবার চোখ পিটপিট করে চারিদিকে তাকালাম। এই জায়গা আমার আজন্ম পরিচিত। হাজি সাহেবের ইটের ভাটা। এইখানেই খেলে খেলে আত বড় হয়েছি আমরা। সকালে ঘুম থেকে উঠে চলে আসতাম ভাটার পাশে বিশাল পুকুরটায়। সেখানে দাপাদাপি করে স্কুল চলে যেতাম। কোনও কোনও দিন স্কুল পালিয়ে এখানে লুকিয়ে থাকতাম। বিশাল পাকুড় গাছটার নীচে বসে কত যে আড্ডা দিয়েছি। এমনকি এখনও প্রতিটা বিকেলে কিছুক্ষণ পাকুড় গাছটার নীচে বসা চাই। কখনও ইটের ভাটায় যেয়ে সবার চোখ ফাঁকি দিয়ে দুই একটা কাঁচা ইট ভেঙ্গে দেওয়ার ছেলেমানুষি খেলাটা এখনও আছে।

রাত কয়টা এখন?? চাঁদের দিকে তাকাই আবার। আহ কি সুন্দর জোছনা নেমেছে আজ চারিদিকে। অথচ কেউ দেখার নেই। দূর থেকে দূরে সুশশান নীরবতা। ইটের মৌসুম না বলে ভাটা বন্ধ। শ্রমিকদের ঘরগুলো পড়ে আছে শ্মশানপুরির মত। ছোটবেলায় শুনেছিলাম এমন রাতেই নাকি অতৃপ্ত সব আত্মা ঘোরাফেরা করে ইটের ভাটায়। কত রাত ভুত দেখার জন্য এসে বসে থেকেছি এখানে। একদিন আব্বার হাতে ধরা পড়লাম। তারপর সে কি মার! তবে তারপরের দিনই আব্বা হাত ধরে এখানে এনেছিলেন। তারপর কত দিন এইভাবে আব্বা হাত ধরে নিয়ে আসেছেন এখানে। আশ্চর্য! হঠাৎ করে এত পুরনো স্মৃতি মনে পরছে কেন??

আমি আমার সামনে বসা ছেলেটার দিকে তাকালাম। কত বয়স হবে ছেলেটার?? ১৬/১৭?? আগে কখনও দেখিনি। এক মন একটার পর একটা সিগারেট ফুঁকছে। গন্ধে বুঝতে পারছি গাঁজা দেওয়া। আমি ছোকরাকে ডাক দিলাম, " এই ছেলে শাকিল কই??" সে আমার দিকে না তাকিয়েই বলল, আইতাছে। বলেই সে থুথু ফেলল সামনে। আমি মুখ ঘুরিয়ে নিলাম।

শাকিল আমাদের পার্টির জুনিয়র কর্মী। যদিও ওর সাথে আমার পরিচয় স্কুল থেকেই। তখন থেকেই ও আমাকে বড় ভাই মানত। তারপর পার্টিতে ঢোকানোর পর তো বাসায় নিয়মিত আসা যাওয়া। আজ এত বাসা থেকে বের হাওয়ার কারনও শাকিল। ও বাসায় আসে বলল, পার্টি অফিসে নেতা এসেছে। কিছুদিন আগে আমাদের সভাপতি খুন হয়, পার্টিরই আরেক অংশের হাতে। তারপর থেকে যখন

তখন হাই কমান্ড থেকে নেতা আসছে। তাই অবিশ্বাসের কিছু নেই। তবু শিউলি, আমার বউ, এত রাতে আমাকে বের হতে দিচ্ছিল না। ওর মন কু ডাকছিল। শাকিল আসে বলল, ভাবি খানিক পরেই চলে আসব। ওর কথা শুনেই আমাকে যেতে দিতে রাজি হল শিউলি। তবু বের হওয়ার সময় হঠাৎ আমার হাত খামচে ধরে গায়ে কি দোয়া পড়ে ফু দিয়ে দিল। আমি বললাম, আব্বার দিকে খেয়াল রেখ। বাসা থেকে বেরিয়ে কিছুদূর যাওয়ার পর দেখি তখনও ও বারান্দায় দাঁড়িয়ে আছে। আবছা অন্ধকারে কি সুন্দর ই না লাগছিল ওকে!!!

আরও কিছুদূর যাওয়ার পর হঠাৎ করেই দুইজন লোক ঝাঁপিয়ে পরল আমার উপর। তারপর কিছু বুঝে ওঠার আগেই চোখ, মুখ আর পেছনে হাত বেঁধে ফেলল। কোনও আওয়াজই করতে পারলাম না। তার আগেই নিঃশব্দে ধাক্কা দিয়ে এগিয়ে নিয়ে যেতে শুরু করল আমাকে। কিছুদূর হাটার পর এই ইটের ভাটায় এসে চোখ খুলে দেয়া হল। কিন্তু তারপর থেকে কিছুই দেখছি না। কারও কোনও উদ্দেশও বুঝতে পারছিনা। শুধু বুকের ভেতর একটা কাঁপুনি টের পাচ্ছি!

খানিক পরেই শাকিলকে দেখতে পেলাম। ওর সাথের আরেকজন। তাকে দেখে চমকে উঠলাম। পার্টির আমাদের বিরোধী অংশের নেতা আমজাদ। চিৎকার করে উঠলাম, শালা ***** তুই!!!! আমজাদ এগিয়ে এসে আমার গালে কষে থাপ্পড় দিল। বলল, ***** পার্টির টাকা কই?? পরের মুহূর্তে আমি বুঝলাম, আর কিছুক্ষণ পর আমাকে খুন করা হবে!

আমার মাথায় রক্ত উঠে গেলো। আমি জানি আমজাদই সভাপতিকে খুন করেছে। আমি সেই মামলার প্রধান সাক্ষী। আমাকে সরিয়ে দিলেই মামলা দুর্বল হয়ে যাবে। পার্টিও চলে যাবে ওর হাতে। আমি খেপা ষাঁড়ের মত আমজাদের দিকে ছুটে গেলাম, ** ***** ** আজ আমি *** ** ** ***। কিন্তু আমার হাত পেছন থেকে বাঁধা। অপরিচিত সেই ছেলেটা একটা ধাক্কা দিতেই ভারসম্য হারিয়ে পরে গেলাম আমি। শাকিল এগিয়ে আসে বলে ভাই কেনও এমন করছেন?? সব বলে দিলেই ছেড়ে দিবে আপনাকে। ভাবির দোহাই আপনি বলেন। আমি শাকিলের দিকে থুতু ছুঁড়ে মারলাম, "তোর অপবিত্র মুখে ভাবির কথা বলবি না মিরজাফরের বাচ্চা"। শাকিল পিছে সরে গেলো, আমজাদের দিকে তাকিয়ে বলল, ভাই দেরি করে লাভ নাই রাত শেষ হয়ে যাচ্ছে। তাড়াতাড়ি কাজ শেষ করেন। আমি দেখলাম সেই ছেলেটা ২টা ইট নিয়ে আসলো। আমজাদ গাঁজাতে শেষ টান দিয়ে একটা ইট হাতে তুলে নিল!

বুঝলাম সময় ফুরিয়ে এসেছে। শিউলির মুখটা ভেসে উঠল চোখের সামনে। বুকটা হঠাৎ শুন্য হয়ে গেলো। কি একটা অদ্ভুত কষ্ট বুকের ভেতর। আর কোনও দিন কি দেখব না ওকে?? আমার কি হয় হঠাৎ জানিনা, আমি হাঁটু গেঁড়ে বসি, শাকিলের দিকে তাকাই, বলি, তোর ভাবি বিধবা হয়ে যাবে

আমাকে ছেড়ে দে শাকিল কথা দিচ্ছি তোদের কোনও ক্ষতি হবে না। শাকিল মুখ ঘুরিয়ে নেয়। আমজাদের দিকে তাকাই, বলি, আমজাদ ভাই টাকা কোথায় আমি সত্যিই জানিনা আমি আপনার নামে সাক্ষীও দিবোনা, আমার বউকে নিয়ে বহুদুর চলে যাবো আপনি আমাকে ক্ষমা করুন। ততখনে আমজাদের ছায়া এসে পরেছে আমার মুখের উপর। কোনও লাভ নেই জেনেও গলা ছেড়ে চিৎকার দিয়ে উঠি, বাঁচাও ও ও ও ও ও । পরের মুহূর্তে আমজাদের হাতের ইট নেমে আসে আমার কপালে।

হঠাৎ অন্ধকার নেমে আসে আমার চোখে। সারা শরীর যন্ত্রণায় ঝিমঝিম করে উঠছে। কাটা কলা গাছের মত এক দিকে হেলে পরতে পরতে চেঁচিয়ে উঠলাম, মাগো ও ও ও। কি আশ্চর্য! সেই ৫ বছর বয়সে মা মারা যাওয়ার পর এই প্রথম মা'র নাম নিলাম! সব কষ্টেই মাকে সবার আগে মনে পরে কেন!!!

পরের মুহূর্তে অচেনা ছেলেটা আরেকটা ইট দিয়ে মারল পাঁজরে। উফফ! কি কষ্ট! টের পাচ্ছি ভিজে যাচ্ছে পায়ের নিচ। হঠাৎ দেখতে পেলাম শিউলি দাঁড়িয়ে আছে আমার পাশে। আমি গুঙিয়ে উঠলাম, ও শিউলি বড় কষ্ট হচ্ছে। একটু পানি খাব। একটু পানি দাও শিউলি বড় কষ্ট!

পরের আঘাতটা পরল মাথাতে। কে মারল দেখার আর শক্তি নেই। শুয়ে পড়েছি মাটিতে। শুধু দেখতে পাচ্ছি পাকুড় গাছের নীচে আব্বা দাঁড়িয়ে আছে। আমার আর কিছু বলার শক্তি নেই। শুধু মনে মনে বলি আব্বা আমাকে নিয়ে যান। আব্বা আমাকে বাঁচান। আব্বা হাত বারিয়ে দিলেন। কিন্তু আমার যে হাত বাঁধা!

তারপর ঘাড়ের কাছে হালকা মুট করে শব্দ হল। পরের মুহূর্তে শরীর থেকে সব যন্ত্রণা হঠাৎ নাই হয়ে গেলো। এক অনিশ্চিত অন্ধকার আর প্রবল বিস্ময় গ্রাস করল আমাকে।

আচ্ছা এটাই তাহলে মৃত্যু??

২

ভোরের কোলে ঘুমিয়ে যেতে শেষ রাত করছে আয়োজন। একে একে সব শব্দ শব্দহীনতার আড়ালে লুকিয়েছে। শুধু ওই প্রাচীন পাকুড় গাছ দাঁড়িয়ে আছে সময়ের সাক্ষী হয়ে। দুটো শেয়াল ধীর কিন্তু নিশ্চিত পদক্ষেপে এগিয়ে যাচ্ছে লাশটার দিকে। উপর হয়ে পরে থাকা লাশটার এক পাশে জমে আছে লালচে রক্ত। বহুদুরে নির্বাক চাঁদটা তখনও আপ্রাণ চেষ্টা করে যাচ্ছে আলো দিয়ে ঢেকে দিতে

মানুষের অন্তরগত অন্ধকার! হায়! বোকা চাঁদটা হয়তো জানেই না, মানুষের রক্তে কখনও জোছনার ছায়া পরে না.....

হার-জিত

অরিত্র খেলাটার নাম দিয়েছিল ভালোবাসার খেলা। খেলাটা হল কে কতক্ষণ পরস্পরের চোখের দিকের পলক না ফেলে তাকিয়ে থাকতে পারে। যে আগে পলক ফেলবে সে হেরে যাবে। আর যে জিতে যাবে

তার ভালোবাসা বেশি। বিস্ময়কর ব্যাপার হল আমি কখনই অরিত্রকে হারাতে পারতাম না। প্রতিবার জিতে ও শিশুর মতো খুশি হয়ে উঠত। আমি রেগে যেতাম, ঝগড়া করতাম, বলতাম, আমিই তোমাকে বেশি ভালোবাসি। ও কিছু না বলে আমার গাল স্পর্শ করতো, বলতো পাগলি মেয়ে। যেই আমি একটু হেসে দিতাম, সাথে সাথে ও বলতো, কিন্তু আমিই বেশি ভালোবাসি। আবার রেগে যাওয়ার একটা ভান করতাম। আবার খুশিও হতাম। কারও কাছে ভালবাসার খেলাতে হেরে যেয়েও সুখ থাকে।

অথচ অরিত্রর সাথে আমি কোনোদিন কথা বলব সেটাও আমার কল্পনার বাহিরে ছিল। আমাদের ক্লাসের সবচেয়ে ভাবওয়ালা ছাত্র ছিল অরিত্র। দেখতে সুন্দর হওয়ায় কিংবা সবচেয়ে ভালো ছাত্র হওয়ায় তার গুণগ্রাহীর অভাব ছিল না। তাই বোধহয় অন্যদের চেয়ে নিজেকে একটু আলাদাই ভাবত ও। আর এটাই আমার সবচেয়ে অপছন্দ ছিল। মুখে স্বীকার না করলেও মনে মনে আমি ওকে হিংসাও করতাম । তাই পুরা দুই বছর একসাথে ক্লাশ করার পরেও ওর সাথে আমার একটা কথাও হয়নি।

আর প্রথম যেদিন কথা হয় সেটাও কথা না। বলা যায় ঝগড়া। সেদিন ছিল র্যাগ ডে। অনুষ্ঠানের মাঝখানে আবিষ্কার করলাম আমার হ্যান্ডব্যাগ পাচ্ছিনা। একজনকে জিজ্ঞাসা করলে বলে আরেকজনের কাছে দেখে। তাকে জিজ্ঞাসা করলে বলে আরেকজনের কাছে। এইভাবে পুরা ভার্সিটি ঘুরেও যখন ব্যাগ না পেয়ে আমি কাঁদতে শুরু করেছি, তখন অরিত্র ব্যাগ নিয়ে এসে বলে, এটা মনে হয় তোমার। ওর হাসি দেখেই বুঝলাম পুরা প্লানটাই ওর ছিল। প্রচণ্ড মেজাজ খারাপ হলো আমার। চিৎকার করে বললাম, তুমি কি ভেবেছ ভালো ছাত্র হয়েছ বলে সাবার মাথা খেয়েছ, যা ইচ্ছে তাই করে বেড়াবে... ও তখনও হাসছিল, বুঝলাম আমি ওর পাতা ফাঁদে পা দিয়েছি কিন্তু একবার শুরু করলে তো আর থেমে যাওয়া যায়না তাই তখনই ওকে চ্যালেঞ্জ করে বসলাম এর পরের পরীক্ষায় আমি ওর চেয়ে ভালো রেজাল্ট করে দেখাবো।

বলার সময় রাগের মাথায় বলে দিয়েছিলাম কিন্তু মাথা ঠাণ্ডা হওয়ার পর বুঝলাম কাজটা কতটা কঠিন। তবুও চেষ্টা চালিয়ে গেলাম। কিন্তু রেজাল্ট বেরনোর পর আবিষ্কার করলাম আমি হেরে গেছি। লজ্জায় যখন চুপচাপ বসে আছি হঠাৎ কই থেকে অরিত্র আসে আমার সামনে বসল। আমি লজ্জায় ওর দিকে তাকাতে পারছিলাম না। ও বলল, আমার সাথে তোমার সমস্যা কি বোলো তো? আমি বললাম, সমস্যা নেই। ও জিজ্ঞাসা করলো তাহলে এতো দূরে দূরে থাকো কেনও? আমি কি উত্তর দিবো এই প্রশ্নের । লজ্জায় লাল হয়ে গেলাম । ও আমাকে সরি বলল। আমি অবাক হয়ে বললাম, সরি কেনও? অরিত্র জবাব দিলো, আমার আচরণে তুমি কষ্ট পেয়ে থাকলে। হঠাৎ করে আমার মনে হল আমি এতদিন ওর সম্পর্কে যা ভেবেছি তা আকান্তই নিজের ঈর্ষার কারনে। এইবার আমি নিজেই

হাত বাড়িয়ে বললাম, আমরা বন্ধু হতে পারি। ও তার ভুবন ভুলানো হাসি দিয়ে আমার আমার বন্ধুত্ব গ্রহণ করেছিলো।

এরপরেই আমি আবিষ্কার করলাম আমাদের মাঝে কোনও মিলই নেই। ওর চাহিদা লক্ষ্য স্বপ্ন সবই আমার উলটো, এমনকি আমাদের পছন্দ অপছন্দও সম্পূর্ণ বিপরীত। তাই এসব নিয়ে সারাক্ষণ আমাদের খুনসুটি লেগেই থাকতো। ওর সাথে সবকিছু নিয়েই তর্ক চলত, আর সবকিছুর শেষে ওর জয়ী হতেই হবে! আর আমি যদি রাগ করতাম তাহলে আমার গাল ছুঁয়ে পাগলি ডাকত আর আমার সব রাগ পানি হয়ে যেত।

এইভাবেই সম্পর্কটা গভীর থেকে গভীরতম অবস্থায় চলে যাচ্ছিল বুঝতে পারছিলাম কিন্তু দুইজনেই চুপ থাকতাম। একদিন এক বৃষ্টির দুপুরে এক চাপড়ার নিচে চা খেতে খেতে কোনও কারন ছাড়াই হঠাৎ আরিত্র বলে বসল, তুই কি আমার সার জীবনের সঙ্গী হবি? আমি চমকে গিয়েছিলাম। প্রস্তুত ছিলাম না বলেই হয়তো ভয় ভালো লাগা অনিশ্চয়তার এক অদ্ভুত শিহরণ বয়ে গিয়েছিল আমার শরীর জুড়ে। খানিকপর নিজেকে সামলে নিয়ে দেখি, গাধাটা এক দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে আছে। আমি লজ্জায় মাথা নিচু করলাম। ও বলল, কি হলো? আমি বললাম, জানিনা। কিছু না বলেই সেদিন আমাদের সম্পর্কটা বদলে গিয়েছিল চিরদিনের মতো।

তারপর শুরু হল পাগলামোর দিন। আমার জন্য কি না কি করতো ও। আমার হাসিমুখ দেখতেই নাকি ওর সব পাগলামো। নিত্য নতুন স্বপ্ন বোনা আর ভালবাসার খেলা ছিল ওর প্রিয় পাগলামো। হয়ত আমার ও। তাই সবসময় ওর কাছে হেরে যেয়েও আনন্দ পেতাম। কখনও কখনও রাগ করার ভান করতাম বতে তখন নতুন এক পাগলামোতে ভাসিয়ে নিয়ে যেত সব।

আমার প্রতিটা বাপারেই ছিল ওর খেয়াল। কোথায় যাবো কি করবো কি পড়ব কি খাবো সব ব্যাপারেই ওর যত্ন । আমার সামান্য জোর বা মনখারাপও ও সহ্য করতে পারত না। ওর যত্নের চূড়ান্ত রূপ দেখেছিলাম আমাকে যখন হাসপাতালে ভর্তি করা হল। কিডনিতে পাথরের কারনে অপারেসন কতে হয়েছিল। আমার আত্মীয় স্বজনের কারনে কাছে আসতে পারত না কিন্তু প্রতিটা মুহূর্তের খোঁজ নিত কারও না কারও মাধ্যমে । আমার মনে হয় শুধু ওর কারনেই আমি ভালো হয়তে পেরেছিলাম। কি অদ্ভুত একটা ভালো লাগা আমাকে আচ্ছন্ন করে রাখত শত দুর্বলতার মাঝেও । কিন্তু ঐ হাসপাতালেই শুনেছিলাম আমার জীবনের সবচেয়ে বড় দুঃসংবাদ । আমার শারিরিক জটিলতা কারনে আমি কখনও মা হয়তে পারবনা । আমার সমস্ত পৃথিবীটা এক মুহূর্তে ধসে গিয়েছিল। আমাই অবিরত

কেঁদে গিয়েছি। কিন্তু এর মাঝেও সান্ত্বনা ছিল অরিত্র। ও আমাকে শক্ত হতে শিখিয়েছিল। ও বলেছিল, কত মানুষেরই তো বাচ্চা হয়না,তারা কি সুখে নেই। দরকার হলে আমরা বাচ্চা দত্তক নিব। ওর কথাতে আমি নতুন ভরসা পেয়েছিলাম। তারপর সুস্থ হয়ে বাসায় ফিরলাম।

এবং বাসায় ফেরার পর আস্তে আস্তে সব পরিবর্তিত হতে লাগলো। আরিত্র মাঝে কি যেন নেই। সেই আগের উচ্ছাস, সেই পাগলামো কতাহ যেন হোঁচট খেয়ে গেছে। ও দেখে সবসময় ক্লান্ত মনে হয়। কিসের সাথে যেন যুদ্ধ করছে সারাক্ষণ। কিছু জিজ্ঞাসা করলে বলে, কই না তো! কিন্তু আমি বুঝতে পেরেছিলা, এখন আর টুং করলে টাং হয়না। মনে মনে আমার আশঙ্কার মেঘ জমে উঠল । তারপর একদিন ওর চেহেরা দেখেই আমি বুঝলাম আজ কিছু একটা হতে চলেছে। আমি মনে প্রার্থনা শুরু করলাম, যা ভাবছি তা যেন না হয় । হয়তো এর আগে আমি কখনই এতো নিবিড় ভাবে স্রস্টাকে ডাকিনি। কিন্তু যা স্রষ্টা আমার কথা শুনলেন না। আরিত্র বলল, ও পারিবারের একমাত্র ছেলে। ওর পরিবার আমাকে কখনই মেনে নিবেনা । আমার একটুও অবাক লাগলো না কথাটা শুনে। আসলে আমি তো জানতামই এমন হবে। আমার কষ্ট হচ্ছিল অরিত্রর নিচু মাথাটা দেখে। ভালোবাসার সবচেয়ে বড় খেলাতেই পরাজিত অরিত্রকে দেখে আমার বুকটা ভেঙ্গে যাচ্ছিল । ইচ্ছে করছিল ওর গাল ছুঁয়ে বলি, পাগল ছেলে। অথচ করলাম তার উল্টো, ওর হাত খামছে ধরে স্বার্থপরের মতো হাহাকার করে উঠলাম, যেও না.....

কিন্তু যে যাবে তাকে ধরে রাখার সাধ্য কোথায় মানুষের। আর অরিত্ররই বা দোষ কি। যে মেয়ে মা হবেনা তাকে কেইবা মেনে নিবে। তাই আমাই অরিত্রর ভালো থাকারই প্রার্থনা করি সবসময়। ভালোও আছে নিশ্চয়ই। আর আমি?? প্রতিদিনই নিত্যনতুন বিয়ের প্রস্তাব পাই। কেউ বুড়ো বিপত্নিক, শেষ বয়সে দেখার কেউ নেই বলে বিয়ে করতে চায়। কেউ সন্তানওয়ালা ডিভোর্সি, সন্তানকে মানুষ করতে আইনত আয়া চায়। এখনও আমি হাঁ না কিছু বলিনি। কিন্তু শেষে এসে মেনে নিতেই হবে। অন্য মানুষের বাগানে মালি হয়ে কাটাতে হবে সারাজীবন। মনের গভীরে লুকিয়ে রাখা স্বপ্নগুলো হারিয়ে যাবে ঝরে পরা তারাগুলোর মতো পরিচয়হীনতায় । এখন মনে হয়, আসলে সব কিছুই তো একটা খেলা। আর কারও কারও জন্মই হয় শুধুই হেরে যাওয়ার জন্য।

তবুও বেঁচে থাকতেই হয় বেঁচে থাকার নিয়মে। হয়তো এইসব না পাওয়াকেই বেঁচে থাকা বলে। হয়তো অপূর্ণতা নামই জীবন .....